Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

“পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর উপর”

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে সালমা শিলা

রোলঃ ২৩০৯০১২০৫১৪

২০ নভেম্বর,২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর উপর

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুষঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে সালমা শিলা

রোলঃ ২৩০৯০১২০৫১৪

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **“পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর উপর”** বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উম্মে সালমা শিলা, আইডিঃ ২৩০৯০১২০৫১৪ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **“পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর উপর”** শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের **মাওলানা মাহবুবুর রহমান** উস্তাযের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

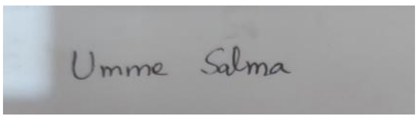

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

আইডিঃ ২৩০৯০১২০৫১৪
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১-ভূমিকা......6

১.১ গবেষণার পটভূমি......6

১.২ গবেষণার তাৎপর্য......7

১.৩ গবেষণার লক্ষ্য......8

১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা......9

১.৫ থিসিসের বিন্যাস......9

অধ্যায় ২-সাহিত্য পর্যালোচনা......11

২.১ মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর মূলভিত্তি......11

২.১.১ বিবাহ ও তালাক......11

২.১.২ উত্তরাধিকার......12

২.১.৩ পিতা-মাতা ও সন্তানের হক......13

২.১.৪ নারীর প্রধান দায়িত্ব......14

২.১.৫ নারীর পর্দা......16

২.২ পশ্চিমা পারিবারিক কাঠামোর মূলভিত্তি......17

২.২.১ একক বা অণু পরিবার......17

২.২.২ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য......18

২.২.৩ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা......19

২.২.৪ সমতাভিত্তিক সম্পর্ক......21

অধ্যায় ৩-পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবের প্রধান ক্ষেত্র......22

৩.১ নারীবাদ......22

৩.২ সমকামিতা......23

৩.৩ পুঁজিবাদ......26

৩.৪ ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র......28

৩.৫ পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব 30
৩.৬ ডারউইনিজম ও বর্ণবাদ...31
৩.৭ পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক প্রভাব..33
৩.৮ অশ্লীল শিল্পকলার প্রসার 34
৩.৯ প্রচার মিডিয়ার উপর কর্তৃত্ব 35
৩.১০ জাতিসংঘ ও বিভিন্ন এনজিও-র ভূমিকা...36
৩.১১ পারিবারিক বন্ধন ছিন্নকরণ 37
৩.১২ সৌন্দর্য্যের বানিজ্যিক প্রদর্শনী ও ফ্যাশন শো সংস্কৃতি...38
৩.১৩ পশ্চিমা দর্শনের মূল উৎস 40
৩.১৪ পশ্চিমাদের উপর পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব..48
৩.১৫ পশ্চিমা প্রভাবের জন্য মুসলিম উম্মাহর পতন 49
অধ্যায় ৪-মুক্তিলাভের উপায়..52
৪.১ দ্বীন প্রতিষ্ঠা 54
৪.২ পারিবারিক বন্ধন দৃঢ়করণ 55
৪.৪ আত্মপরিচয়ের জাগরণ...57
৪.৫ ইসলামী জাতীয়তাবাদ...58
৪.৬ শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার...59
৪.৭ গণমাধ্যমে নৈতিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা..61
৪.৮ সমাজ ও নেতৃত্বের ভূমিকা 62
৪.৯ মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্তি...64
৪.১০ দু'আ ও আত্মশুদ্ধি 65
অধ্যায় ৫-উপসংহার 68

অধ্যায় ১-ভূমিকা

১.১ গবেষণার পটভূমি

মানবজীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেমন ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলাম কেবল নামাজ, রোযা বা অন্যান্য ইবাদতের ধর্ম নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা মানুষকে নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও ভারসাম্যের শিক্ষা দেয়। এই ইসলামি জীবনব্যবস্থা একদিকে মানুষকে আধ্যাত্মিক শান্তি দান করে, অন্যদিকে পারিবারিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতাও নিশ্চিত করে। ইসলামী সংস্কৃতি পরিবারকে সমাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দেখে, যেখানে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, দায়িত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতাই সম্পর্কের ভিত্তি।

কিন্তু বর্তমান যুগে বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত বিস্তারের ফলে পৃথিবী যেন একটিমাত্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে রূপ নিচ্ছে। এই পরিমণ্ডলের নেতৃত্বে রয়েছে পাশ্চাত্য বা পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতি, যা জীবনযাপনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই গভীর প্রভাব বিস্তার করছে যেমন খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, বিনোদন, পারিবারিক সম্পর্ক, শিক্ষা, এমনকি ধর্মীয় মূল্যবোধেও। এর বিপরীতে, পশ্চিমা সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বস্তুবাদ (Materialism), ধর্মনিরপেক্ষতা, যৌন স্বাধীনতা, নারীর স্বাধীনতার নামে পারিবারিক বন্ধন শিথিলকরণ, এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনধারা ।পাশ্চাত্য সভ্যতা গড়ে উঠেছে মানুষকেন্দ্রিক চিন্তা ও বস্তুবাদী আদর্শে। সেখানে মানুষ নিজেই নিজের পথপ্রদর্শক। ধর্ম সেখানে ব্যক্তিগত জীবনে সীমিত।

ফলস্বরূপ, মুসলিম সমাজ, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জনগোষ্ঠী এই প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাবের কারণে মুসলিম সমাজ সেই নৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্য থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি কর্তৃক প্রচারিত ভোগবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের দর্শন মুসলিম সমাজের পারিবারিক জীবনের আদর্শিক ধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজ তরুণ প্রজন্মের চিন্তা, পোশাক, জীবনধারা, এমনকি পারিবারিক দায়িত্ববোধেও এই প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। যার ফলে মুসলিম পারিবারিক কাঠামো আজ নানা জটিল চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়েছে।

ইসলাম আত্মাকে শুদ্ধ করতে শেখায়। পশ্চিমা সভ্যতা শেখায় আরাম ও স্বাধীনতার নামে আত্মপ্রবঞ্চনা। পশ্চিমা সমাজ প্রযুক্তিতে উন্নত হলেও নৈতিক দিক থেকে দুর্বল। মুসলিম সমাজ

সেই জীবনধারার অনুসরণ শুরু করলে তাদের আত্মিক শক্তি হারিয়ে যাবে।আজকের বিশ্বায়নের যুগে এই প্রভাব আরও স্পষ্ট। টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ফ্যাশন, শিক্ষা ও অর্থনীতির মাধ্যমে পশ্চিমা সংস্কৃতি দ্রুত মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে।মুসলিম পরিবার একসময় নৈতিকতা, ভালোবাসা ও দায়িত্বের কেন্দ্র ছিল। এখন অনেক পরিবারে সেই মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে। সন্তানরা পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা হারাচ্ছে। পারস্পরিক সহযোগিতা কমছে। পশ্চিমা জীবনধারা এখন অনেক মুসলমানের কাছে উন্নতির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।ফলে পরিবারে পর্দা, লজ্জা ও সংযমের জায়গায় এসেছে প্রদর্শন, প্রতিযোগিতা ও বিলাসিতা। নারীর মর্যাদার জায়গায় এসেছে স্বাধীনতার নামে দায়িত্বহীনতা। পুরুষের নেতৃত্বের জায়গায় এসেছে অনিয়ন্ত্রিত সমতা।

এই প্রভাব শুধুমাত্র পরিবারে নয়, সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। শিক্ষায় ধর্মীয় মূল্যবোধ কমছে। মিডিয়া তরুণদের মনে পশ্চিমা জীবনধারাকে আকর্ষণীয় করে তুলছে। অর্থনীতি ও রাজনীতিতে নৈতিকতার পরিবর্তে লাভই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।ইসলাম বলে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য রাখতে হবে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা সেই ভারসাম্য ভেঙে দিয়েছে। তারা উন্নতির নামে আল্লাহর বিধান থেকে দূরে চলে গেছে। মুসলিম সমাজ সেই পথ অনুসরণ করে নিজেদের আত্মপরিচয় হারাতে বসেছে।এ কারণেই আজ মুসলিম সমাজ এক বড় সংকটের মুখে। তারা একদিকে ইসলামি মূল্যবোধ রক্ষা করতে চায়, অন্যদিকে পশ্চিমা জীবনধারার আকর্ষণে পড়ে। এই দ্বন্দ্বই আধুনিক মুসলিম সমাজের নৈতিক ও পারিবারিক দুর্বলতার মূল কারণ।

১.২ গবেষণার তাৎপর্য

আজ মুসলিম সমাজ এক কঠিন সাংস্কৃতিক চাপে রয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতা আধুনিকতার নামে নতুন চিন্তা ও আচরণ ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই পরিবর্তন ধীরে ধীরে মুসলিম পারিবারিক জীবনকে বদলে দিচ্ছে। মুসলিম সমাজের অনেকেই এখন মনে করে, উন্নত জীবন মানে পশ্চিমা জীবনধারা অনুসরণ করা। এই ভুল ধারণা ইসলামি নৈতিকতা ও আত্মপরিচয়কে দুর্বল করছে। ফলে মুসলিম সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক ভাঙন ও ধর্মীয় উদাসীনতা বাড়ছে। এই গবেষণা মুসলিম সমাজকে বোঝাতে সাহায্য করবে যে আধুনিকতা মানেই পশ্চিমা জীবন নয়। ইসলামও আধুনিক, কিন্তু তার আধুনিকতা নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে।

গবেষণাটি পরিবার, শিক্ষা, অর্থনীতি ও সমাজে ইসলামি মূল্যবোধের গুরুত্ব তুলে ধরবে। এটি দেখাবে কিভাবে ইসলাম মানুষের আত্মিক ও সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখে।

এই ধারণা বর্তমান মুসলিম তরুণ প্রজন্মকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারবে।গবেষণাটি শিক্ষাবিদ, অভিভাবক ও নীতিনির্ধারকদের জন্যও সহায়ক হবে। তারা জানতে পারবেন কিভাবে পরিবারে ইসলামি চেতনা ফিরিয়ে আনা যায়। এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পশ্চিমা প্রভাব থেকে রক্ষা করার পথ দেখাবে। অন্যদিকে, একাডেমিক দিক থেকেও এই গবেষণার মূল্য অনেক।এটি ইসলামি সমাজতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন ও নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিকোণ যোগ করবে।এছাড়া এটি ইসলামি ও পশ্চিমা সভ্যতার সম্পর্ক নিয়ে ভবিষ্যতের গবেষণার ভিত্তি তৈরি করবে।সব মিলিয়ে এই গবেষণা মুসলিম সমাজের জন্য এক ধরনের আত্মজাগরণের আহ্বান।এটি দেখাবে, উন্নতি ও আধুনিকতার প্রকৃত অর্থ হলো নৈতিকতা, আত্মিক শক্তি ও পারিবারিক ঐক্য রক্ষা করা।

১.৩ গবেষণার লক্ষ্য

এই থিসিসের মূল লক্ষ্য হলোঃ

১. পশ্চিমা সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য নির্ধারণঃ

পশ্চিমা সভ্যতা কীভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ভোগবাদ, বস্তুবাদ ও যৌন মুক্তির ধারণাকে প্রচার করে এবং এই ধারণাসমূহ মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা।মিডিয়া, শিক্ষা ও প্রযুক্তির মতো মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে পশ্চিমা জীবনধারার প্রসার কীভাবে হচ্ছে, তা পর্যবেক্ষণ করা।

২. মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর মৌলিক ভিত্তি চিহ্নিত করাঃ

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে পারিবারিক কাঠামোর উদ্দেশ্য, লিঙ্গভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টন, ভালোবাসা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার মূল্য বিশ্লেষণ করা।কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী পরিবারের আদর্শ চিত্র ও রক্ষাকবচসমূহ উপস্থাপন করা।

৩. মুসলিম পারিবারিক সম্পর্কের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করাঃ

দাম্পত্য জীবন, পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রগুলো কীভাবে পশ্চিমা ধারণার প্রভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তা চিহ্নিত করা।কর্মজীবী নারী, একক পরিবার এবং সন্তান প্রতিপালনের নতুন ধারা কতটা পশ্চিমা প্রভাবিত তা যাচাই করা।

৪. সামাজিক ও নৈতিক পরিণতি বিশ্লেষণঃ

মুসলিম সমাজে পারিবারিক বন্ধনের দুর্বলতা, বিবাহবিচ্ছেদ, প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব ও নৈতিক অবক্ষয়ের মতো সমস্যাগুলোর পেছনে পশ্চিমা প্রভাবের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা নির্ণয় করা।এসব পরিবর্তনের ফলে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর কী দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়ছে, তা ব্যাখ্যা করা।

৫. পশ্চিমা প্রভাব থেকে মুক্তি বা প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণঃ

ইসলামিক শিক্ষা, পরিবারভিত্তিক নৈতিক চর্চা ও গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকা বিশ্লেষণ করে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্যকর ও বাস্তবসম্মত মুক্তির পথ খোঁজা।

১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণাটি মূলত সাহিত্যভিত্তিক।এতে কোনো মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি। তাই বিশ্লেষণগুলো বই, প্রবন্ধ ও অনলাইন সূত্রের ওপর নির্ভরশীল।সময় ও উপকরণের সীমাবদ্ধতার কারণে গবেষণার ক্ষেত্র কিছুটা সীমিত রাখা হয়েছে।সব মুসলিম দেশের সামাজিক বাস্তবতা এতে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি।তবে সাধারণ প্রবণতা বোঝাতে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।আরও একটি সীমাবদ্ধতা হলো ভাষা ও উৎসের প্রাপ্যতা।অনেক পশ্চিমা গবেষণাপত্র ইংরেজিতে হওয়ায় সেগুলোর অনুবাদে কিছু ব্যাখ্যার পার্থক্য থাকতে পারে।তবুও গবেষণায় ইসলামী ও পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশ্লেষণ এখানে সীমিতভাবে দেওয়া হয়েছে।কারণ গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো তার প্রভাব মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর উপর দেখা।তাই রাজনৈতিক বা দার্শনিক বিশ্লেষণ বিস্তারিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।এছাড়া, এই গবেষণায় সমাজের নির্দিষ্ট কোনো বয়স বা শ্রেণি আলাদা করে বিশ্লেষণ করা হয়নি।পুরো মুসলিম সমাজকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা হয়েছে।তবুও, এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও গবেষণাটি পশ্চিমা প্রভাবের বাস্তবতা ও ইসলামী প্রতিকারের দিকগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

১.৫ থিসিসের বিন্যাস

এই গবেষণাটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত।প্রতিটি অধ্যায় নির্দিষ্ট একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সাজানো হয়েছে।প্রতিটি অংশ পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য ভিত্তি তৈরি করে।

অধ্যায় ১-ভূমিকাঃ এই অধ্যায়ে গবেষণার পটভূমি, সমস্যা, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে।এখানে বোঝানো হয়েছে কেন এই গবেষণা প্রয়োজন এবং এটি কাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যায় ২-সাহিত্য পর্যালোচনাঃ এই অধ্যায়ে ইসলামি ও পশ্চিমা পারিবারিক কাঠামোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।এখানে বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, পিতা-মাতার হক, নারীর দায়িত্ব এবং পশ্চিমা পারিবারিক মূল্যবোধের ভিত্তি আলোচনা করা হয়েছে।এছাড়া প্রাসঙ্গিক বই, প্রবন্ধ ও পূর্ববর্তী গবেষণার সারসংক্ষেপও এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত।

অধ্যায় ৩-পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবের প্রধান ক্ষেত্রঃ এই অধ্যায়ে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম সমাজে কীভাবে প্রবেশ করছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।নারীবাদ, সমকামিতা, পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র, মিডিয়া, শিল্প ও ফ্যাশন সংস্কৃতি এসব ক্ষেত্রের বিশ্লেষণ এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় ৪-মুক্তিলাভের উপায়ঃ এই অধ্যায়ে কী কী উপায় অবলম্বন করলে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুসলিম জাতি মুক্তিলাভ করতে পারবে সেটা আলোচনা করা হয়েছে।ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিকারমূলক করণীয় আলোচিত হয়েছে।

অধ্যায় ৫-উপসংহারঃ এই অধ্যায়ে পুরো গবেষণার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে।এখানে গবেষণার ফলাফল ও ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় ২-সাহিত্য পর্যালোচনা

২.১ মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর মূলভিত্তি

২.১.১ বিবাহ ও তালাক

ইসলামি পারিবারিক কাঠামোর কেন্দ্রীয় ভিত্তি হলো বিবাহ। এটি কেবল দুটি মানুষের মধ্যে একটি সামাজিক চুক্তি নয়, বরং এটি একটি পবিত্র ইবাদত এবং পারিবারিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার মূল চাবিকাঠি। বিবাহের মাধ্যমে সমাজে শৃঙ্খলা, ভালোবাসা ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা পায়।

কুরআনে বলা হয়েছে,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটি একটি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করো এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া স্থাপন করেছেন"।(সূরা আর-রূম, ৩০:২১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হবে, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়"[১]।ইসলামে বিবাহের লক্ষ্য হলো মানসিক প্রশান্তি, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ, এবং নৈতিক জীবনের সংরক্ষণ। স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের জন্য "পোশাকস্বরূপ" ।অর্থাৎ উভয়ে একে অপরের আবরণ ও রক্ষক।

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরাও তাদের পোশাক"।(সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৭)

অন্যদিকে তালাক হলো এমন একটি প্রয়োজনীয় কিন্তু অপছন্দনীয় বিধান, যা দাম্পত্য সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লে অনুমোদিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় বৈধ কাজ হলো তালাক"[২]।

কুরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তালাকের আগে সালিস ও পুনর্মিলনের চেষ্টা করতে হবে,

"যদি তোমরা তাদের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা কর, তবে তার পরিবার থেকে একজন সালিস এবং তার পরিবার থেকে একজন সালিস পাঠাও"।(সূরা আন-নিসা, ৪:৩৫)

অতএব, ইসলামী দৃষ্টিতে বিবাহ হলো সামাজিক স্থিতিশীলতা ও নৈতিকতার ভিত্তি, আর তালাক হলো একটি সীমিত সুযোগ যা ন্যায়, সংযম ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

[১]সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৬

[২]আবু দাউদ, হাদীস নং ২১৭৮

২.১.২ উত্তরাধিকার

ইসলামে উত্তরাধিকার হলো ন্যায়, ভারসাম্য এবং পারিবারিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। ইসলাম এমন একটি সমাজব্যবস্থা গঠন করেছে যেখানে প্রত্যেক সদস্য তার প্রাপ্য অধিকার পায়, আর কোনো পক্ষ যেন বঞ্চিত না হয়। জাহেলিয়াতের যুগে নারীরা ও শিশুদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো। সম্পদের মালিকানা কেবল প্রভাবশালী পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইসলাম এসে এই বৈষম্য দূর করে সবার জন্য ন্যায়সঙ্গত অংশ নির্ধারণ করেছে।কুরআনে আল্লাহ বলেন,

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ * لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন পুত্রের অংশ হবে কন্যার অংশের দ্বিগুণ" (সূরা আন-নিসা, ৪:১১)।

এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম উত্তরাধিকারে দায়িত্ব ও ন্যায়ের ভারসাম্য নিশ্চিত করেছে। পুরুষের ওপর পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব বর্তায় বলে তার অংশ কিছুটা বেশি নির্ধারিত হয়েছে। আবার অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ

"পুরুষদের জন্য রয়েছে পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদের অংশ, এবং নারীদের জন্যও রয়েছে তাদের নির্ধারিত অংশ" (সূরা আন-নিসা, ৪:৭)।

এর মাধ্যমে ইসলাম প্রথমবারের মতো নারীদেরও সম্পদের মালিকানা ও উত্তরাধিকার অধিকার প্রদান করেছে, যা তৎকালীন সমাজে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছিল।রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করো"[৩]।

উত্তরাধিকার ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হলোঃ

১. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং সম্পদের কেন্দ্রীকরণ রোধ করা।

২. পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রাখা।

৩. সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও সমান সুযোগ সৃষ্টি করা।

আধুনিক সমাজে সম্পদ নিয়ে দ্বন্দ্ব ও নারীর অধিকারবঞ্চনার যে প্রবণতা দেখা যায়, তার মূল কারণ ইসলামী বিধান থেকে বিচ্যুতি। ইসলাম যদি সঠিকভাবে অনুসৃত হয়, তবে উত্তরাধিকার

---

[৩]সহীহ মুসলিম, হাদিস নং-৩৯৯৮

ব্যবস্থাই পারিবারিক ঐক্য, সামাজিক ভারসাম্য এবং নৈতিক স্থিতিশীলতার ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

২.১.৩ পিতা-মাতা ও সন্তানের হক

ইসলাম পারিবারিক জীবনের ভিত্তি হিসেবে দায়িত্ব, ভালোবাসা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। এই পারিবারিক কাঠামোর অন্যতম প্রধান সম্পর্ক হলো পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক। কুরআন ও হাদীসের আলোকে দেখা যায়, এই সম্পর্ক কেবল রক্তের নয়, এটি একটি নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব, যেখানে উভয় পক্ষেরই একে অপরের প্রতি নির্দিষ্ট অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব

কুরআনে বারবার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও শ্রদ্ধার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَقَضٰی رَبُّکَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِیَّاہُ وَبِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا یَبۡلُغَنَّ عِنۡدَکَ الۡکِبَرَ اَحَدُہُمَاۤ اَوۡ کِلٰہُمَا فَلَا تَقُلۡ لَّہُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنۡہَرۡہُمَا وَقُلۡ لَّہُمَا قَوۡلًا کَرِیۡمًا

"তোমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি তাঁকে ছাড়া কাউকে উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন বা উভয়ে যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের 'উফ' পর্যন্ত বলো না এবং তাদের ধমক দিও না, বরং তাদের সঙ্গে সম্মানজনকভাবে কথা বলো।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:২৩)।

এই আয়াতে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্বকে আল্লাহর উপাসনার সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের মর্যাদার গভীরতা প্রকাশ করে। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, পিতা-মাতার সন্তুষ্টিই আল্লাহর সন্তুষ্টি।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে নিহিত, আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে নিহিত।"[৪]

অতএব, সন্তানের কর্তব্য হলো পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, তাদের সেবাযত্ন করা, জীবিত অবস্থায় আদেশ মেনে চলা এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য দোয়া করা।

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব

ইসলামে সন্তানকে আল্লাহর দান ও দায়িত্ব উভয় হিসেবে দেখা হয়। কুরআনে বলা হয়েছে,

[৪]তিরমিজি, হাদীস ১৮৯৯

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো” (সূরা আত-তাহরীম,৬৬:৬)।

এর মাধ্যমে বোঝা যায়, সন্তানদেরকে সঠিক ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিক দিকনির্দেশনা দেওয়া পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব।রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

“তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষক এবং প্রত্যেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করবে।একজন পুরুষ তার পরিবারের জন্য রক্ষক এবং একজন নারী তার স্বামীর ঘরের জন্য রক্ষক।”[৫]

এই হাদীস স্পষ্ট করে দেয় যে, পিতা-মাতা সন্তানদের ঈমান, আদব, শিষ্টাচার ও চরিত্র গঠনের জন্য দায়ী। সন্তানদের সঠিক শিক্ষাদান, হালাল রুজির ব্যবস্থা এবং সৎ পরিবেশ সৃষ্টি করা তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

আজকের বিশ্বে, বিশেষ করে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে, এই সম্পর্কের দূরত্ব বাড়ছে, বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বাড়ছে, সন্তানরা ব্যস্ত জীবনে পিতা-মাতাকে অবহেলা করছে, আবার অনেক পিতা-মাতা সন্তানদের নৈতিক দিকনির্দেশনা দিতে পারছেন না। ইসলাম এই সংকটের সমাধান দিয়েছে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের মাধ্যমে।

২.১.৪ নারীর প্রধান দায়িত্ব

ইসলাম নারীকে এমন এক মর্যাদা দিয়েছে, যা পৃথিবীর অন্য কোনো সভ্যতায় দেখা যায় না। ইসলাম নারীর সম্মান, নিরাপত্তা এবং দায়িত্বকে এমনভাবে নির্ধারণ করেছে, যাতে সে সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। নারী কেবল ঘরের মানুষ নয়, বরং তিনি একজন মা, স্ত্রী, শিক্ষিকা এবং সমাজ গঠনের মূল চালিকা শক্তি।

ইসলামী দৃষ্টিতে নারীর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো পরিবারকে রক্ষা করা ও সন্তানদের সঠিকভাবে গড়ে তোলা। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

“তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করো এবং পূর্বযুগের অজ্ঞ নারীদের মতো নিজেদের প্রদর্শন করো না” (সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৩৩)।

---

[৫]সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৯৩

এখানে “ঘরে অবস্থান” বলতে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা বোঝানো হয়নি; বরং নারী যেন পরিবারের মর্যাদা, শালীনতা ও নৈতিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখে, সেটাই বোঝানো হয়েছে। ইসলাম নারীর জন্য ঘরকে একটি নিরাপদ ও সম্মানজনক জায়গা হিসেবে বিবেচনা করেছে, যেখানে সে ভালোবাসা ও দায়িত্বের মাধ্যমে সমাজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “নারী তার স্বামীর ঘরে রক্ষক এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করবে”[৫]।

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, ইসলাম নারীকে পরিবারের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছে। সে শুধু পরিবারের সেবা করে না, বরং সবার নৈতিকতা, আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্কের মান উন্নত রাখার দায়িত্বও পালন করে। একজন নেককার নারী তার পরিবারের জন্য শান্তি ও প্রশান্তির উৎস।

ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও নিষেধাজ্ঞা নেই। সে ইচ্ছা করলে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা বা অন্য যেকোনো বৈধ পেশায় কাজ করতে পারে, তবে শর্ত হলো তা যেন ইসলামী পর্দা ও পারিবারিক দায়িত্বের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়। কুরআনে বলা হয়েছে,

لِّلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

“পুরুষদের জন্য রয়েছে যা তারা অর্জন করেছে, এবং নারীদের জন্যও রয়েছে যা তারা অর্জন করেছে” (সূরা আন-নিসা, ৪:৩২)।

এই আয়াত প্রমাণ করে যে নারীও তার পরিশ্রম ও অর্জনের অধিকারী।

আজকের আধুনিক সমাজে, বিশেষ করে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে, নারীর স্বাধীনতাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। কর্মজীবনের নামে, ফ্যাশনের নামে, এবং তথাকথিত মুক্তির নামে নারীদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। এর ফলে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং সন্তান প্রতিপালনের মান কমে যাচ্ছে। ইসলাম এই চরম অবস্থার বিপরীতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে। ইসলাম নারীর মর্যাদা ও স্বাধীনতাকে স্বীকার করে, তবে বলে যে প্রকৃত সম্মান অর্জিত হয় দায়িত্ব ও সংযমের মাধ্যমে, অন্ধ অনুকরণে নয়।

ইসলামী দৃষ্টিতে নারী সমাজের মেরুদণ্ড। তার কোমলতা, ধৈর্য, ভালোবাসা ও প্রজ্ঞা পরিবারে শান্তি আনে এবং সমাজে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করে। তিনি পরিবারের জন্য যেমন আশ্রয়, তেমনি সমাজের জন্য আলোর দিশারী।

[৫]সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৯৩

২.১.৫ নারীর পর্দা

ইসলামে পর্দা কেবল পোশাকের নিয়ম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ নৈতিক আদর্শ। পর্দা নারীর মর্যাদা, সম্মান এবং নিরাপত্তা রক্ষার একটি উপায়, যা সমাজে শালীনতা ও নৈতিক পরিবেশ বজায় রাখে। ইসলাম নারীর জন্য যে পর্দার নির্দেশ দিয়েছে, তার উদ্দেশ্য নারীকে সীমাবদ্ধ করা নয়, বরং তাকে সম্মান ও নিরাপত্তা প্রদান করা।

কুরআনে আল্লাহ বলেন, "হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন নিজেদের উপর চাদর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে এবং তারা কষ্টে পড়বে না" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৫৯)।

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে, পর্দার মাধ্যমে নারীকে সমাজে সম্মানজনক ও নিরাপদ অবস্থানে রাখা হয়। ইসলাম নারীকে তার সৌন্দর্য ও গঠনকে প্রকাশ না করে সংযত থাকার নির্দেশ দিয়েছে, যাতে সমাজে অশ্লীলতা, কুদৃষ্টি ও অনৈতিক আচরণের বিস্তার না ঘটে।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "লজ্জা ঈমানের একটি শাখা"[৬]।

এই হাদীস প্রমাণ করে যে পর্দা কেবল শরীর ঢেকে রাখার বিষয় নয়, বরং এটি মানুষের অন্তরের এক গুণ যেখানে দৃষ্টি, আচরণ, কথা ও চিন্তায়ও সংযম প্রকাশ পায়। পর্দা নারীকে সমাজের কুপ্রভাব ও লোভনীয় প্রলোভন থেকে রক্ষা করে, আর একই সঙ্গে সমাজে নৈতিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।পর্দা নারীর সামাজিক অবস্থানকে উন্নত করে এবং তাকে সম্মানিত নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে যেখানে নারীকে স্বাধীনতার নামে প্রকাশ্যে আনা হচ্ছে, সেখানে ইসলাম তাকে মর্যাদা ও নিরাপত্তার ছায়ায় রেখেছে। পশ্চিমা ধারণায় পর্দা নারীর সীমাবদ্ধতার প্রতীক, কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিতে এটি তার মুক্তি ও মর্যাদার প্রতীক।ইসলাম পুরুষদের প্রতিও দৃষ্টি সংযমের নির্দেশ দিয়েছে।

কুরআনে বলা হয়েছে,

قُلۡ لِّلۡمُؤۡمِنِیۡنَ یَغُضُّوۡا مِنۡ اَبۡصَارِہِمۡ وَیَحۡفَظُوۡا فُرُوۡجَہُمۡ

"মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান রক্ষা করে" (সূরা আন-নূর, ২৪:৩০)।

এরপর নারীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে,

وَقُلۡ لِّلۡمُؤۡمِنٰتِ یَغۡضُضۡنَ مِنۡ اَبۡصَارِہِنَّ وَیَحۡفَظۡنَ فُرُوۡجَہُنَّ وَلَا یُبۡدِیۡنَ زِیۡنَتَہُنَّ

---

[৬]সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৬

"মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে" (সূরা আন-নূর, ২৪:৩১)।
অর্থাৎ পর্দা কেবল নারীর দায়িত্ব নয়, সমাজের উভয় পক্ষেরই দায়িত্ব হলো পরস্পরের প্রতি সম্মান বজায় রাখা এবং নৈতিক আচরণ করা।

২.২ পশ্চিমা পারিবারিক কাঠামোর মূলভিত্তি

২.২.১ একক বা অণু পরিবার

পশ্চিমা সমাজে পরিবারের যে কাঠামোটি বর্তমানে সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং আধুনিকতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত, সেটি হলো একক বা অণু পরিবার। এই কাঠামোতে কেবল স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত সন্তানরা একত্রে বসবাস করেন। এই মডেলটি মূলত বিংশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লব এবং ব্যাপক নগরায়ণ-এর সরাসরি পরিণতি। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পার্সনস এর মতো চিন্তাবিদগণ এই মত দেন যে, আধুনিক শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির জন্য অণু পরিবার অপরিহার্য ছিল, কারণ এটি মানুষকে পেশাগত গতিশীলতা দেয় এবং ঐতিহ্যবাহী আত্মীয়-স্বজনের প্রভাব বা কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত রাখে। এই কাঠামোটিই পশ্চিমা জীবনধারার মূল চালিকাশক্তি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়, যেখানে প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও গোপনীয়তা পরিবারের সমষ্টিগত চাহিদার চেয়ে বেশি মূল্যবান।[৭]
কিন্তু এই স্বাধীনতা এবং ক্ষুদ্রতার ধারণার সঙ্গে সুদূরপ্রসারী ও ক্ষতিকর সামাজিক প্রভাব যুক্ত। অণু পরিবারে আন্তঃপারিবারিক সহযোগিতা এবং ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সহায়তার বন্ধনগুলো ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে যায়। যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কাজের জগতে পুরোপুরি ব্যস্ত থাকেন, তখন পরিবারে কোনো বড় ধরনের সমস্যা, অসুস্থতা বা মানসিক সংকট দেখা দিলে প্রবীণ আত্মীয়-স্বজনের নৈতিক ও ব্যবহারিক সমর্থনের অভাব অনুভূত হয়। সবচেয়ে মর্মান্তিক পরিণতি দেখা যায় পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের ক্ষেত্রে। অণু পরিবারের মডেল প্রবীণদের প্রতি সম্মান ও যত্নের অভাব সৃষ্টি করে, যার ফলে পশ্চিমা বিশ্বে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে এবং বয়স্ক মানুষরা একাকীত্ব ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় ভুগছেন।

[৭] Parsons, T., & Bales, R. F. (1955). Family, Socialization and Interaction Process. New York: Free Press

অণু পরিবারের এই বিচ্ছিন্নতা শুধু প্রবীণদেরই নয়, বরং সন্তান প্রতিপালন এবং সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রেও বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। সন্তানরা প্রবীণদের কাছ থেকে পাওয়া নৈতিক শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং সাংস্কৃতিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলস্বরূপ, পরিবার ধীরে ধীরে একটি সামাজিক বন্ধন ও নৈতিক ইউনিট থেকে সরে গিয়ে কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিছু মানুষের চুক্তিতে পরিণত হয়। সমাজ বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, সমাজে যখন সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয় এবং ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতা বাড়ে, তখন মানসিক অস্থিরতা ও নৈতিক আদর্শহীনতা বৃদ্ধি পায়। এখানে দাম্পত্য সম্পর্ক টিকে থাকার প্রধান ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় পারস্পরিক সুবিধা ও মানসিক চাহিদা পূরণ। যখনই ব্যক্তিগত সুবিধা ব্যাহত হয়, তখনই সম্পর্ক ভেঙে দিতে দ্বিধা কম থাকে, যার কারণে বিবাহবিচ্ছেদের হার বিপজ্জনকভাবে বাড়ে।

‘ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত’ গ্রন্থে লেখক মোহাম্মদ আসাদ বলেছেন, মুসলিম সমাজকে পশ্চিমা অনুকরণের মানসিকতা পরিহার করতে হবে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, মুসলিমদের উচিত তাদের দ্বীন ও সমাজব্যবস্থা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখা এবং তাদের স্বকীয়তাকে একটি শক্তিশালী প্রাচীর হিসেবে ব্যবহার করা। এই ইসলামী স্বকীয়তা পারিবারিক বন্ধনকে ভাঙনের হাত থেকে সুরক্ষা দেয় এবং পশ্চিমা সমাজের ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনধারাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। ইসলামী সংস্কৃতি যেখানে যৌথতা, দায়িত্ববোধ এবং পারস্পরিক সহানুভূতিকে উৎসাহিত করে পরিবারকে সামাজিক স্থিতিশীলতার মেরুদণ্ড হিসেবে দেখে, সেখানে অণু পরিবার সেই ঐতিহ্যবাহী যৌথ পারিবারিক বন্ধনকে চ্যালেঞ্জ করে পরিবারকে একটি ভঙ্গুর এবং সাময়িক চুক্তিতে পরিণত করেছে।

২.২.২ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্যতম মূল দার্শনিক ভিত্তি হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। এই ধারণা অনুযায়ী, একজন মানুষের জীবন, সিদ্ধান্ত, সম্পর্ক এবং সুখ সবকিছুই তার নিজস্ব স্বাধীনতা ও ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। এখানে ব্যক্তির ইচ্ছাই প্রধান কর্তৃপক্ষ। পরিবার, ধর্ম, ঐতিহ্য বা সমাজের সম্মিলিত মতামতের চেয়ে তার ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য ও আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এই দর্শনটি মানুষের মনে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করে যে, ব্যক্তিগত সুখ ও স্বাধীনতা অর্জনই জীবনের প্রধান লক্ষ্য, এবং এই লক্ষ্যের পথে কোনো প্রথাগত বন্ধন বাধা হতে পারবে না।

এই চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা পারিবারিক বন্ধনকে একেবারে দুর্বল করে দেয়। ইসলাম যেখানে বিবাহকে পবিত্র অঙ্গীকার এবং কর্তব্যের ভিত্তি হিসেবে দেখে, সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রভাবে বিবাহ একটি সাময়িক চুক্তিতে পরিণত হয়। যদি সেই চুক্তি কোনো পক্ষের ব্যক্তিগত সুখ বা চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তবে সম্পর্কটি সহজেই ভেঙে দেওয়া হয়, ফলে বিবাহবিচ্ছেদের হার বাড়ে। নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে এমন এক মানসিকতা তৈরি হয়, যেখানে পারস্পরিক ত্যাগ বা নির্ভরতার চেয়ে নিজের স্বাধীনতা ও সুখই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এই আত্মকেন্দ্রিকতার কারণে ভোগবাদী জীবনযাত্রা উৎসাহিত হয়, এবং মানুষ দ্রুত নিজের ইচ্ছা পূরণের দিকে ধাবিত হয়। সন্তান লালন-পালন বা প্রবীণ পিতা-মাতার সেবা করাকে তখন অনেকেই মানসিক বা সামাজিক বোঝা মনে করে, যার ফলে পিতা-মাতা ও সন্তান আলাদা বসবাস করে এবং প্রবীণদের প্রতি যত্নের অভাব দেখা দেয়।

এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক দর্শনের বিপদ সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব' গ্রন্থে জোরালোভাবে আলোকপাত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, পশ্চিমা জীবন ও সংস্কৃতির মূল চালিকাশক্তি হলো ভোগবাদ ও আত্মপূজা, যা ইসলামি সমাজের ত্যাগ ও তৌহিদভিত্তিক জীবনধারণের সম্পূর্ণ বিপরীত। অনুরূপভাবে, মোহাম্মাদ আসাদ তাঁর 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত' গ্রন্থে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে মুসলিম উম্মাহর নৈতিক ও সামাজিক ভাঙনের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি যুক্তি দেন যে, এই দর্শন মুসলিমদেরকে তাদের সমষ্টিগত দায়িত্ব, পারিবারিক নৈতিকতা এবং দ্বীনের প্রতি অঙ্গীকার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ইসলাম যেখানে পরিবার ও সমাজের কল্যাণে ব্যক্তির স্বার্থ ত্যাগ করতে শেখায়, সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কেবল নিজের ইচ্ছাপূরণের দিকে চালিত করে, যা মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর স্থিতিশীলতাকে গভীরভাবে চ্যালেঞ্জ করছে।

২.২.৩ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

শিল্পবিপ্লবের পর পশ্চিমা সমাজে নারী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়ে ওঠা ছিল এক বিশাল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব। এই পরিবর্তন একদিকে নারীর আত্মমর্যাদা ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে, যা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়িয়েছে, অন্যদিকে এই স্বাধীনতাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ভোগবাদী দর্শনের সাথে যুক্ত করার কারণে পারিবারিক সম্পর্কের ঐতিহ্যবাহী ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে।

আজ পশ্চিমা সমাজে অনেক নারী আর্থিকভাবে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হওয়ায় বিবাহের প্রয়োজনীয়তা কম মনে করেন। যেহেতু তারা নিজেরাই নিজেদের ভরণপোষণ করতে সক্ষম, তাই বিবাহকে তারা আর অর্থনৈতিক নিরাপত্তার মাধ্যম হিসেবে দেখেন না। বরং এটিকে একটি ঐচ্ছিক ও সাময়িক চুক্তি হিসেবে বিবেচনা করেন, যা ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য বজায় না থাকলে সহজেই বাতিল করা যায়। এর ফলে বিবাহবিচ্ছেদের হার বাড়ে এবং পারিবারিক স্থিতিশীলতার মূল ধারণাটি দুর্বল হয়ে পড়ে।

পশ্চিমা সংস্কৃতিতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কর্মজীবী হওয়ার কারণে পারিবারিক জীবন বহুলাংশে অবহেলিত হয়। সময়ের অভাবের কারণে সন্তান প্রতিপালন ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো উপেক্ষা করা হয় বা ডে-কেয়ার সেন্টারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এর ফলে শিশুরা পর্যাপ্ত পারিবারিক সময় এবং নৈতিক কাঠামো থেকে বঞ্চিত হয়, যার কারণে তাদের নৈতিক গঠন দুর্বল হয় এবং মানসিক শূন্যতা বা অস্থিরতা দেখা যায়। এভাবে সম্পর্কের উষ্ণতা হ্রাস পায়, এবং পরিবার একটি আবেগপূর্ণ আশ্রয়কেন্দ্রের বদলে আর্থিক সুবিধার লক্ষ্যে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

সমাজবিজ্ঞানী অ্যান্থনি গিডেন্স (Anthony Giddens) তাঁর The Transformation of Intimacy (১৯৯৯) গ্রন্থে যেমন দেখিয়েছেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার কারণে বিবাহ এখন আর সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি ‘বিশুদ্ধ সম্পর্কে’ পরিণত হয়েছে, যা কেবল পারস্পরিক মানসিক ও যৌন সন্তুষ্টির ওপর ভিত্তি করে টিকে থাকে এবং এই সন্তুষ্টি শেষ হলেই সম্পর্ক সহজেই ভেঙে যায়।

এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অপব্যবহারের বিপদ তুলে ধরে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর ‘ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, পশ্চিমা সমাজের নৈতিক ভিত্তির দুর্বলতার কারণে এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত ভোগবাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতার জন্ম দেয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যখন দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতার সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ হয় না, তখন তা পরিবারে দূরত্ব ও মানসিক শূন্যতা সৃষ্টি করে। ইসলাম অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়। কুরআনে বলা হয়েছে,

وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

"নারীদের জন্যও রয়েছে যা তারা অর্জন করেছে" (সূরা আন-নিসা, ৪:৩২) ।

তবে ইসলাম সর্বদা বলে যে এই স্বাধীনতা যেন পারিবারিক শান্তি, সন্তানের যত্ন এবং দায়িত্ব পালনের পথে কোনো বাধা সৃষ্টি না করে। এই ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ায় পশ্চিমা পরিবার একটি স্থায়ী বন্ধন হিসেবে ব্যর্থ হয়েছে।

২.২.৪ সমতাভিত্তিক সম্পর্ক

পশ্চিমা পারিবারিক কাঠামোর মূলনীতি হলো পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠা করা। এই ধারণা অনুযায়ী, পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আয়-ব্যয় এবং সন্তান প্রতিপালন সহ সকল ক্ষেত্রে উভয়ের সমান মতামত ও অধিকার থাকবে। পশ্চিমা নারীবাদী দর্শন দ্বারা চালিত এই নীতিটি মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিবাচক মনে হলেও, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর বাস্তব প্রয়োগ পরিবারে স্থিতিশীলতার পরিবর্তে সংঘাত সৃষ্টি করেছে। যখন স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের কাছ থেকে সকল ক্ষেত্রে সমান ভূমিকা ও সমান দায়িত্ব পালনের প্রত্যাশা করা হয়, তখন এই ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে, যা অনিবার্যভাবে বিবাহবিচ্ছেদ ও পারস্পরিক সংঘাতের হার বাড়িয়ে তোলে।

ইসলামও নারী-পুরুষকে মর্যাদা ও মানবিক মূল্যে সমান বলে ঘোষণা করেছে। যেমনটা লায়লা আহমেদ (Leila Ahmed) তাঁর Women and Gender in Islam (১৯৯২) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইসলামে এই সম্পর্কটি সমতার ভিত্তিতে নয়, বরং পরিপূরকতার ভিত্তিতে গঠিত। পুরুষ পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব (রোজগার ও ভরণপোষণ) গ্রহণ করে, আর নারী পরিবারের অভ্যন্তরীণ শান্তি, সুশৃঙ্খলতা ও সন্তান প্রতিপালনের প্রধান দায়িত্ব পালন করে।

[৮]বারবারা স্টাওয়াসের (Barbara Stowasser) এবং জন এসপোসিতো (John Esposito) তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন, ইসলামে দায়িত্বের এই বিভাজন নারীকে অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিয়ে পরিবারে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিশ্চিত করে।পশ্চিমা সমতাবাদী ধারণাটি ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা এবং ঐশী বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে একটি সম্পূর্ণ মানবকেন্দ্রিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এর ফলস্বরূপ, পারিবারিক কাঠামো অনেক বেশি চুক্তিভিত্তিক ও অস্থায়ী হয়ে পড়েছে, যেখানে নৈতিকতা, আত্মত্যাগ এবং নিঃশর্ত দায়িত্ববোধের স্থান ক্রমেই কমে যাচ্ছে।

---

[৮]Esposito, J. L. (1998). Islam and Politics (4th ed.), (1982). Women in Muslim Family Law ,Syracuse University Press
[৮]Stowasser, B. (1994). Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation. New York: Oxford University Press.

অধ্যায় ৩-পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবের প্রধান ক্ষেত্র

৩.১ নারীবাদ

নারীবাদ হলো এমন একটি আন্দোলন, যা মূলত পশ্চিমা সমাজে নারী অধিকারের দাবিতে শুরু হয়েছিল। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল নারীদেরকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া এবং সামাজিক বৈষম্য দূর করা[৯]। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলন ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দূরে সরে গিয়ে এমন এক মতবাদে পরিণত হয়েছে, যা পরিবার ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ জানায়।পশ্চিমা সমাজে নারীবাদ শুরু হয় ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের সময়, যখন নারীরা শ্রমবাজারে প্রবেশ করে এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে। তখন থেকেই তারা নিজেদের স্বাধীন সত্তা ও সমান অধিকারের দাবি তোলে। ধীরে ধীরে এই আন্দোলন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপ নেয়[১০]।তবে এই ধারণা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করার পর তা ইসলামী পারিবারিক কাঠামোতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। ইসলামে নারীকে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার ভূমিকা পরিবারকেন্দ্রিক, যেখানে সে মা, স্ত্রী ও নৈতিকতার রক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। ইসলাম নারীকে শিক্ষা, সম্পদ ও মতামতের অধিকার দিয়েছে, কিন্তু তাকে পুরুষের প্রতিযোগী নয়, সহযোগী হিসেবে দেখেছে।কুরআনে বলা হয়েছে,

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

"পুরুষরা নারীদের অভিভাবক, কারণ আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠতা দিয়েছেন এবং তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে।"(সূরা আন-নিসা, ৪:৩৪)।

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, ইসলাম পুরুষকে পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব দিয়েছে, আর নারীকে দিয়েছে নৈতিক ও পারিবারিক ভূমিকার মর্যাদা। কিন্তু পশ্চিমা নারীবাদ এই দায়িত্ববোধকে অসমতা হিসেবে উপস্থাপন করেছে[১১]। এর ফলে অনেক মুসলিম নারী আজ গৃহস্থালি দায়িত্বকে অবমূল্যায়ন করছে, বিবাহকে বাধা মনে করছে এবং সন্তানের লালনকে সীমাবদ্ধতা হিসেবে দেখছে।পশ্চিমা নারীবাদ মুসলিম সমাজে "Modern Womanhood" ধারণা প্রচার করেছে।এই

---

[৯]Mernissi, F. (1991). The Veil and the Male Elite. Addison-Wesley.

[১০]Ahmed, L. (1992). Women and Gender in Islam. Yale University Press

[১১]Stowasser, B. (1994). Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation. Oxford University Press.

ধারণা অনুযায়ী, একজন নারী তখনই সফল যখন সে স্বাধীন, কর্মজীবী এবং পুরুষের সমান অবস্থানে থাকে। কিন্তু এতে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়েছে, নারী-পুরুষ সম্পর্ক প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে, এবং নৈতিকতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে[১২]।আজ মুসলিম সমাজে নারীরা টেলিভিশন, মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পশ্চিমা নারীদের মতো পোশাক, আচরণ ও জীবনধারা অনুসরণ করছে। অনেকে মনে করেন, এটি স্বাধীনতার প্রতীক, কিন্তু বাস্তবে এটি পশ্চিমা প্রভাবের মাধ্যমে পারিবারিক ঐক্যকে ভেঙে দিচ্ছে।ইসলাম নারীকে কখনও গৃহবন্দী করে রাখেনি। বরং ইসলাম নারীকে শিক্ষা, উত্তরাধিকার, সম্পদ ও সামাজিক অংশগ্রহণের পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। পার্থক্য হলো, ইসলাম নারীকে পারিবারিক দায়িত্বের কেন্দ্রস্থলে রেখেছে। পশ্চিমা নারীবাদ সেই ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে।ফলস্বরূপ, নারীবাদের নামে এখন মুসলিম সমাজে অনেকেই পশ্চিমা মূল্যবোধ অনুসরণ করছে।পর্দাহীনতা, একক জীবন, দেরিতে বিয়ে, মাতৃত্বের অনাগ্রহ এসব ধারা ধীরে ধীরে বাড়ছে। এতে পরিবার শুধু দুর্বল হচ্ছে না, সমাজের নৈতিক ভিত্তিও ভেঙে পড়ছে।ইসলাম নারীকে ঘরের কন্যা নয়, বরং সমাজের আলোকবর্তিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। নারীবাদ তাকে সেই আলো থেকে সরিয়ে অন্ধ প্রতিযোগিতায় নামিয়েছে। তাই ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নারীবাদকে সংস্কারের নামে একধরনের সাংস্কৃতিক আক্রমণ বলা যায়।

৩.২ সমকামিতা

সমকামিতা এমন এক আচরণ, যা ইসলামসহ প্রায় সব ঐতিহ্যবাহী ধর্মেই নিষিদ্ধ। কিন্তু পশ্চিমা সমাজে একে এখন স্বাভাবিক যৌন প্রবণতা হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে। আধুনিক পশ্চিমা সংস্কৃতিতে এটি কেবল সহনশীলতার বিষয় নয়, বরং মানবাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ধারণা এখন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে এবং মুসলিম সমাজেও তার প্রভাব দেখা যাচ্ছে। সমকামিতা প্রচারে পশ্চিমা গণমাধ্যম ও লিবারেল গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা আজ অত্যন্ত শক্তিশালী। [১৩]আমেরিকার সমকামী অ্যাডভোকেসি গ্রুপ GLAAD-এর এক জরিপ অনুযায়ী, ২০১৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হলিউড সিনেমার প্রায় ১২.৮ শতাংশে LGBT চরিত্র দেখানো হয়েছে। অথচ Gallup-এর তথ্যমতে আমেরিকার মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪.৫ শতাংশ LGBT পরিচয়ে পরিচিত। অর্থাৎ বাস্তব সংখ্যার তুলনায় মিডিয়াতে তাদের উপস্থিতি অনেক বেশি।

---

[১২]Esposito, J. (2001). Women in Muslim Family Law. Syracuse University Press

[১৩]Weeks, J. (1985). Sex, Politics and Society: The Regulation of Sexuality since 1800. Longman

একইভাবে গত ১৫ বছরের প্রায় সব প্রাইমটাইম টিভি শোতেও অন্তত একটি সমকামী বা ট্র্যান্সজেন্ডার চরিত্র রাখা হচ্ছে। আমেরিকান মিডিয়ার দর্শক শুধু আমেরিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এই কনটেন্ট দেখে। ফলে সমকামী আচরণ, সমলিঙ্গ বিয়ে, এবং বিকৃত যৌনাচারকে সাধারণ ও স্বাভাবিক ধারণা হিসেবে বিশ্বব্যাপী উপস্থাপন করা হচ্ছে।
[১৪]বর্তমানে পৃথিবীর ১৯৫টি দেশের মধ্যে ১২৪টিতে সমকামিতা বৈধ এবং ২৭টি দেশে সমলিঙ্গ বিবাহ অনুমোদিত। আরও অনেক দেশ ধীরে ধীরে এই বৈধতার পথে এগোচ্ছে। বাংলাদেশে সমকামিতা প্রচারের সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠীগুলোর বক্তব্যেও একই ধরণের বার্তা দেখা যায়,তারা বলে, "সমকামিতা ভালো বা খারাপ কিছু না, এটি শুধু জীবনের একটি বাস্তবতা।" পহেলা বৈশাখে শাহবাগে সমকামী প্যারেড, ঈদের নাটকে সমকামী চরিত্র তুলে ধরা, কিংবা সমকামিতাকে সংস্কৃতির অংশ হিসেবে দেখানোর চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হলো একটি ক্ষুদ্র, বিকৃত আচরণকে স্বাভাবিক ও সমাজের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।
[১৫]জাতিসংঘের Free & Equal প্রচারণাতেও সমকামিতাকে জাতিগত বা সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মতো তুলে ধরা হয় যেন এটি মানবসত্তার স্বাভাবিক একটি বৈশিষ্ট্য। Kirk-Madsen-এর কৌশল অনুযায়ী সমকামীদের দুইভাবে ভিকটিম হিসেবে দেখানো হয়:

১) সমকামী আচরণকে জন্মগত বা প্রাকৃতিক বলে দাবি করা,

২) সমাজ দ্বারা তারা অত্যাচারিত,এমন ধারণা তৈরি করা।

বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে সমকামী প্রচারণায় এই দুই মোটিফ স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

বাংলাদেশে সমকামিতা প্রচারের সবচেয়ে বড় ধাক্কা আসে ২০১৪ সালে "রূপবান" ম্যাগাজিন প্রকাশের মাধ্যমে। এই ম্যাগাজিনকে প্রচারের জন্য আন্তর্জাতিক শক্তিশালী গোষ্ঠীও সামনে আসে। প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট গিবসন, ব্যারিস্টার সারা হোসেনসহ দেশি-বিদেশি নানা ব্যক্তি। এর খবর প্রচার করে The Daily Star, Dhaka Tribune, Bangla Tribune এবং BBC-এর মতো গণমাধ্যম। এরপর ২০১৫ সালে ঢাকার ব্রিটিশ কাউন্সিলে প্রায় দুই শতাধিক সমকামীর অংশগ্রহণে 'ধী' নামে সমকামী চরিত্রকে কেন্দ্র করে আরেকটি অনুষ্ঠান করা হয়।

---

[১৪]Kligerman, N. (2007). Homosexuality in Islam. Journal of Homosexuality

[১৫]Admin (2022). Western Culture Aggression in Muslim Society: A Comparative Analysis. Journal of Humanities and Social Science, Vol. 15,Issue 1, p. 39

এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে আন্তর্জাতিক সমকামী নেটওয়ার্ক বাংলাদেশেও সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এবং তারা সংগঠিতভাবে সমাজে সমকামিতাকে স্বাভাবিক করে তুলতে চাইছে।ইসলামের দৃষ্টিতে যৌন সম্পর্কের একমাত্র বৈধ পথ হলো বিবাহ, একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ
وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ

"বিশ্বজগতের সমস্ত মানুষের মধ্যে তোমরাই কি এমন, যারা পুরুষে উপগমন কর। আর বর্জন করে থাক তোমাদের স্ত্রীগণকে, যাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন? প্রকৃতপক্ষে তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।"(সূরা আশ-শুআরা, ২৬:১৬৫–১৬৬)।

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, পুরুষের সঙ্গে পুরুষের যৌন সম্পর্ক আল্লাহর সীমালঙ্ঘন। হযরত লুত (আ.)-এর জাতি এ ধরনের আচরণের কারণে আল্লাহর গজবে ধ্বংস হয়েছিল। ইসলামী ইতিহাসে এটি সর্বদাই পাপ ও নৈতিক অধঃপতন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু আধুনিক পশ্চিমা সমাজে ২০শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে যৌন স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে সমকামিতা স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালের পর থেকে ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক দেশে সমকামিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়[১৬]। এরপর তা বিদ্যালয়, সিনেমা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, এমনকি শিশুদের পাঠ্যবইয়েও ঢুকে পড়ে।পশ্চিমা সমাজে সমকামিতাকে কেবল আইনগত বৈধতা দেওয়া হয়নি, বরং একে "আধুনিক সভ্যতার সূচক" হিসেবে প্রচার করা হয়েছে। অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেমন জাতিসংঘের অধীন কিছু মানবাধিকার সংগঠন, মুসলিম দেশগুলোকে এই নীতি গ্রহণে চাপ দিচ্ছে। ফলে মুসলিম সমাজে তরুণ প্রজন্ম বিভ্রান্ত হচ্ছে।তারা ভাবছে এটি আধুনিকতার অংশ।সমস্যা হলো, এই প্রভাব মুসলিম সমাজের নৈতিক ও পারিবারিক কাঠামোতে বড় ধরণের আঘাত হেনেছে।যেখানে ইসলামে পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি হলো পুরুষ ও নারীর বৈধ বিবাহ, সেখানে সমকামিতা সেই ভিত্তিকে ভেঙে দেয়।এর ফলে সন্তানের পরিচয়, বংশধারা ও সমাজের নৈতিক দিক ধ্বংসের মুখে পড়ে।সমকামিতা শুধু একটি যৌন আচরণ নয়, এটি এক ধরণের সাংস্কৃতিক চিন্তা, যা মানবজীবনের মূলনীতিকে অস্বীকার করে। পশ্চিমা গণমাধ্যম, সিনেমা ও সংগঠনগুলো এখন একে "ভালোবাসা"র নামে প্রচার করছে। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিতে এটি ভালোবাসা নয়, বরং

[১৬]Esposito, J. L. (2003). Islam and Homosexuality: Faith and Morality. Oxford University Press

প্রকৃতির বিপরীত প্রবণতা যা সমাজের নৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করে।নবী করিম (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি লুত জাতির কাজ করবে, তাকে এবং যার সঙ্গে তা করা হবে, উভয়কেই শাস্তি দেওয়া হবে।"[১৭]

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, ইসলাম সমকামিতাকে কেবল পাপ নয়, সমাজের জন্য বিপজ্জনক কাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।আজকের মুসলিম সমাজে এই বিষয়টি ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও পশ্চিমা শিক্ষাক্রমে "LGBT rights" নিয়ে প্রচারণা বাড়ছে। অনেক মুসলিম তরুণ এটি নিয়ে কৌতূহল ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে ভাবছে, যা ধর্মীয়ভাবে বিপজ্জনক। ইসলাম কাউকে ঘৃণা করতে শেখায় না, তবে পাপাচারকে স্বীকৃতি দিতে নিষেধ করে [১৮]।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষকে তওবা ও আত্মশুদ্ধির সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমা সমাজে এই পাপকে গর্ব বা অধিকার হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। মুসলিম সমাজ যদি এই প্রভাব প্রতিরোধে সচেতন না হয়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নৈতিক অবক্ষয়ে পতিত হবে।তাই প্রয়োজন পরিবার ও শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী নৈতিকতা পুনরুজ্জীবিত করা। তরুণদের বোঝাতে হবে, ইসলাম স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু সীমাহীন স্বাধীনতাকে নয়। কারণ সীমাহীন স্বাধীনতা নৈতিকতা ধ্বংস করে, আর নৈতিকতার পতনই সমাজের পতনের সূচনা।

৩.৩ পুঁজিবাদ

পুঁজিবাদ হলো এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তিগত সম্পদ, মুনাফা ও বাজার নিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতাই মূল নীতি। এই ব্যবস্থার সূচনা পশ্চিমা ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে। এর মাধ্যমে পশ্চিমা সমাজ দ্রুত উন্নত হলেও, একই সঙ্গে সেখানে জন্ম নেয় ভোগবাদ,শ্রেণিবৈষম্য এবং নৈতিক অবক্ষয়।পশ্চিমা পুঁজিবাদের মূলমন্ত্র হলো ,"যার যত বেশি সম্পদ,সে তত বেশি সফল।" ফলে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা না করে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। নৈতিকতা, আত্মত্যাগ ও সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্বার্থই হয়ে ওঠে জীবনের লক্ষ্য।এই দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম সমাজেও ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে, বিশেষ করে মিডিয়া, ব্যবসা ও শিক্ষার মাধ্যমে।

---

[১৭]তিরমিজি, হাদীস ১৪৫৬

[১৮]Yusuf al-Qaradawi (1999). The Lawful and the Prohibited in Islam. American Trust Publications

ইসলাম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্পদ অর্জনকে কখনও নিষিদ্ধ করেনি। বরং ইসলাম ন্যায্য উপায়ে উপার্জন ও দানশীলতাকে উৎসাহ দেয়। কুরআনে বলা হয়েছে,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

"যারা সোনা-রুপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তির 'সুসংবাদ' দাও।"(সূরা আত-তাওবা, ৯:৩৪)।

ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ হলো একটি আমানত, যার সঠিক ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু পুঁজিবাদ সম্পদকে উপভোগের উপকরণ হিসেবে দেখে, দায়িত্বের মাধ্যম হিসেবে নয়। ফলে মানুষ ধনসম্পদের দাসে পরিণত হয়।পুঁজিবাদ মুসলিম সমাজে "Modern Consumer Culture" নামে একটি মানসিক পরিবর্তন এনেছে[১৯]। মানুষ এখন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ব্যয় করছে, নামি ব্র্যান্ড ব্যবহার করছে, সাজসজ্জা ও বিলাসিতায় ডুবে যাচ্ছে। এতে সমাজে আভিজাত্যের দৌড় বেড়েছে, কিন্তু আত্মিক শান্তি কমেছে।এই সংস্কৃতি ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজের নৈতিক ও পারিবারিক কাঠামো দুর্বল করে দিয়েছে। আগে পরিবার মানে ছিল পারস্পরিক সহযোগিতা, আত্মত্যাগ ও মিতব্যয়িতা। এখন অনেক পরিবারে অর্থই হয়ে উঠেছে প্রধান লক্ষ্য। সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্কও অনেক সময় আর্থিক নির্ভরতার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।ইসলামী অর্থনীতি এই পুঁজিবাদী চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলাম বলে, সম্পদ সমাজের নির্দিষ্ট শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত নয়।

কুরআনে বলা হয়েছে,

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ

"যাতে সে সম্পদ তোমাদের মধ্যকার কেবল বিত্তবানদের মধ্যেই আবর্তন না করে।"(সূরা আল-হাশর, ৫৯:৭)।

অর্থাৎ সম্পদের পুনর্বণ্টন, যাকাত, সদকা এগুলোর মাধ্যমে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কিন্তু পুঁজিবাদ এই ন্যায়বোধকে অস্বীকার করে, কারণ এর লক্ষ্য কেবল মুনাফা অর্জন।পশ্চিমা সমাজে এই পুঁজিবাদী জীবনযাপন মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করেছে। সেখানে সফলতা মানে বড় বাড়ি, দামি গাড়ি ও বিলাসবহুল জীবন। ইসলাম বলে, সফলতা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। তাই মুসলিম সমাজে যখন পুঁজিবাদের প্রভাব বাড়ে, তখন আত্মিক দিক দুর্বল হয় এবং মানুষ আধ্যাত্মিক শূন্যতায় ভোগে।পুঁজিবাদের মাধ্যমে পশ্চিমা দেশগুলো মুসলিম সমাজের উপর এক ধরনের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা তৈরি করেছে।

[১৯]Weber, M. (1905). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: Unwin Hyman

মুসলিম দেশগুলো এখন উন্নয়নের নামে পশ্চিমা ব্যাংক ও সংস্থার ঋণের ওপর নির্ভর করছে। এর মাধ্যমে পশ্চিমা শক্তি মুসলিম দেশগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলছে।এইভাবে পুঁজিবাদ শুধু অর্থনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক উপনিবেশও সৃষ্টি করেছে। মুসলিম সমাজে নৈতিকতা ও আত্মসম্মান টিকিয়ে রাখতে হলে ইসলামি অর্থনৈতিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে। যাকাত, সুদবিরোধী লেনদেন, ন্যায্য মজুরি ও নৈতিক ব্যবসা এসব ইসলামী নীতি বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করলেই পুঁজিবাদের অমানবিক দিক প্রতিরোধ করা সম্ভব।সুতরাং, পশ্চিমা পুঁজিবাদ একদিকে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু অন্যদিকে নৈতিকতা ও পরিবারকে দুর্বল করে দেয়। ইসলাম তার বিকল্প দিয়েছে যেখানে সম্পদ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ন্যায় ও দায়িত্বও অপরিহার্য।

৩.৪ ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র

গণতন্ত্র হলো এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে। সাধারণভাবে এটি বোঝায়, যে দেশের মানুষ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে, যারা সরকারের নীতি নির্ধারণে অংশ নেয়।আজকের পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে দুটি ধারণার ওপর,ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র। পশ্চিমা চিন্তায় এই দুই নীতি সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়। তাদের বিশ্বাস, পৃথিবীতে যে জাতি জ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে সবচেয়ে অগ্রসর, তাদের গড়ে তোলা সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবেই সবার জন্য আদর্শ হওয়া উচিত। যেহেতু পশ্চিমারা নিজেদেরকে আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত ও সফল জাতি মনে করে, তাই তারা মনে করে তাদের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং জীবনধারাই মানবজাতির কাছে সর্বোত্তম পথ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। এই ধারণা থেকেই তারা বিশ্বব্যাপী নিজেদের আদর্শ ছড়িয়ে দিতে চায় এবং অন্য সমাজগুলোর ওপরও তা অনুসরণের চাপ সৃষ্টি করে।

পশ্চিমা দেশগুলোতে গণতন্ত্রকে ব্যক্তিস্বাধীনতা, ভোটাধিকার ও সমানাধিকার হিসেবে প্রচার করা হয়[২০]।পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্র মানে হলো স্বাধীন চিন্তাভাবনা, মত প্রকাশের অধিকার ও ব্যক্তিগত অধিকারের সুরক্ষা। তবে বাস্তবে এই ব্যবস্থায় প্রায়ই দেখা যায় যে বড় অর্থনৈতিক শক্তি ও মিডিয়ার প্রভাবের কারণে জনগণের মতামত প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ গণতন্ত্রের আদর্শ ও বাস্তবতার মধ্যে ফারাক থাকে।

---

[২০]Dahl, R. A. (1989). Democracy and Its Critics. Yale University Press

পশ্চিমা গণতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো “Political Consumerism”[২১]। এখানে মানুষ শুধু ভোট দেওয়ার মধ্য দিয়ে নয়, বরং বাজার ও মিডিয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রভাবও সৃষ্টি করতে পারে। এতে করে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব পশ্চিমা দিক থেকে মুসলিম সমাজে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে।তবে ইসলামী নীতিতে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে। অর্থাৎ জনগণের সিদ্ধান্তও আল্লাহর নির্দেশ ও ন্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। পশ্চিমা গণতন্ত্রের মত “লোকের ইচ্ছা সর্বোচ্চ” নীতি ইসলামী দৃষ্টিতে সীমাহীন নয়।পশ্চিমা গণতন্ত্র প্রায়ই ধর্ম, নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বাইরে রাখে। ফলে মুসলিম সমাজে এর প্রভাব দেখা যায় যে, কিছু নৈতিক ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতাকে উপেক্ষা করা হয়, যেমন পোশাক, পারিবারিক নীতি ও সামাজিক আচরণ।

পশ্চিমা গণতন্ত্র মুসলিম দেশগুলোতে “Cultural Liberalization” নিয়ে এসেছে[২২]। এখানে মূলত স্বাধীনতা ও অধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও, এটি অনেক সময় পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামো দুর্বল করে। উদাহরণস্বরূপ, পারিবারিক সিদ্ধান্তে বড়দের সম্মান, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও অভ্যন্তরীণ নৈতিক নিয়ম প্রায়ই অবহেলিত হয়।ইসলামিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এই সমস্যার সমাধান দেয়। ইসলামে সমাজের সকল সদস্যের অধিকার রক্ষা করা হয়, কিন্তু তা আল্লাহর বিধানের সীমার মধ্যে।

গণতন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের উপর পশ্চিমা প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমা গণতন্ত্র ইসলামী নৈতিকতা ও সামাজিক নিয়মে প্রভাব ফেলে, যাতে মুসলিম জনগণ স্বাধীনতার নামে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি ও পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামি সমাজে ধর্ম ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র আলাদা নয়; বরং একজন মুসলিমের বিশ্বাস, ইবাদত, নৈতিকতা, আইন, রাজনীতি এবং সমাজ সবকিছুই ইসলামি নীতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। ইসলাম মনে করে, একটি প্রকৃত ইসলামি সমাজ হলো এমন একটি সমাজ যেখানে জনগণের জীবনে আল্লাহর বিধানই মূল দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। তাই মুসলিমদের শিক্ষাব্যবস্থা, শাসননীতি এবং বিচারব্যবস্থা সবই কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া অপরিহার্য।

---

[২১]Lippmann, W. (1922). Public Opinion. Harcourt, Brace & Company

[২২]Huntington, S. P. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বাইরে অন্য কোনো মানব-নির্মিত আইন দিয়ে বিচার বা শাসন করা ইসলাম অনুযায়ী একটি গুরুতর বিচ্যুতি, এবং কুরআনে এটিকে কুফর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে,

وَمَنۡ لَّمۡ یَحۡكُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الۡكٰفِرُوۡنَ

"যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির" (সূরা মায়িদা ৫:৪৪)।

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতার এই মৌলিক পার্থক্য আসলে জীবনদৃষ্টির ভিন্নতা থেকে উদ্ভূত। ইসলাম মনে করে মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য, এবং দুনিয়ার জীবন হলো পরকালের প্রস্তুতি। এজন্য আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে মানুষকে সৎকর্ম, ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিক জীবনের বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে;পরিবার, অর্থনীতি, ন্যায়বিচার, নৈতিকতা, সমাজসংগঠন,ইসলাম পূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করে। ফলে মুসলিম জাতির অন্য কোনো সভ্যতা বা সংস্কৃতি থেকে মূল্যবোধ ধার করার প্রয়োজন নেই। তাদের জীবনযাপনের সম্পূর্ণ কাঠামো আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের আলোকে পরিচালিত হওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ, স্থায়ী এবং ন্যায়সঙ্গত পথ।

৩.৫ পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব

পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদ হলো একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে পশ্চিমা দেশগুলো তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব দিয়ে অন্য দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি শুধুমাত্র ভূ-রাজনৈতিক ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও গভীর প্রভাব ফেলে।

ইতিহাসে দেখা যায়, ইউরোপীয় দেশগুলো আফ্রিকা, এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশকে রাজনৈতিকভাবে দাসত্বের মতো নিয়ন্ত্রণ করেছিল। তারা শাসনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সমাজে তাদের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক নিয়মও প্রবেশ করিয়েছিল[২৩]।

---

[২৩]Hobson, J. A. (1902). Imperialism: A Study. London: James Nisbet & C।।

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম সমাজে মূলত তিনটি ধরণের প্রভাব ফেলেছে[২৪]:

1. **সাংস্কৃতিক প্রভাব:** পশ্চিমা সাহিত্য, চলচ্চিত্র, ফ্যাশন, বিলাসিতা ও জীবনধারার ধারণা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। এতে স্থানীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা দুর্বল হয়েছে।
2. **অর্থনৈতিক প্রভাব:** পশ্চিমা দেশগুলো তাদের কোম্পানি, ব্যাংক ও ব্যবসায়িক নিয়মের মাধ্যমে মুসলিম দেশগুলোর অর্থনীতিতে প্রভাব রেখেছে। ফলে দেশগুলো ঋণের মধ্যে আটকা পড়ে এবং স্বাধীন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে গেছে।
3. **রাজনৈতিক প্রভাব:** পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ প্রায়ই মুসলিম দেশগুলোর শাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেছে। নির্বাচনের ধরণ, আইন ও প্রশাসনিক কাঠামো প্রায়শই পশ্চিমা মডেলের অনুকরণে পরিবর্তিত হয়েছে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, এই সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম সমাজের স্বাধীনতা, নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা হ্রাস করছে। ইসলাম সব ধরনের অন্যায় ও শোষণ বিরোধী।
কুরআনে বলা হয়েছে,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَـكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ

“হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।” (সূরা আন-নিসা, ৪:২৯)

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ শুধুমাত্র সামরিক বা রাজনৈতিক দখলের মাধ্যমে নয়, মানসিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের মাধ্যমেও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। এটি মুসলিম যুবসমাজে পশ্চিমা মূল্যবোধ ও ভোগবিলাসী জীবনধারার প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়েছে।ফলে, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ শুধুমাত্র বহিরাগত দখল নয়, এটি একটি মানসিক ও সাংস্কৃতিক উপনিবেশের প্রক্রিয়া। মুসলিম সমাজে আত্মসম্মান, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ইসলাম এই ধরণের প্রভাব প্রতিহত করতে ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের উপর গুরুত্ব দেয়।পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদ একটি জটিল প্রক্রিয়া, যা শুধু রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৩.৬ ডারউইনিজম ও বর্ণবাদ

ডারউইনের বিবর্তনবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো তার বর্ণবাদী ধারণা। তিনি মনে করতেন

[২৪]Said, E. W. (1978). Orientalism. Pantheon Books.

মানুষেরা একই পূর্বপুরুষ থেকে এলেও সকল জাতির বিবর্তন সমানভাবে ঘটেনি। তার ধারণা ছিল সাদা চামড়ার ইউরোপীয়রা অন্য জাতিগুলোর তুলনায় বেশি উন্নত, আর কালো চামড়ার বা অ-ইউরোপীয় সম্প্রদায়গুলো কম বিবর্তিত। তাই তাদের মধ্যে নাকি বানর-সদৃশ বৈশিষ্ট্য বেশি দেখা যায়। ডারউইন তার “The Descent of Man” বইয়ে স্পষ্টভাবে দাবি করেন যে মানবজাতির মধ্যে বিবর্তনের পার্থক্যই নরগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সক্ষমতার পার্থক্য তৈরি করেছে। তার এই মতবাদ ভিক্টোরিয়ান যুগের আগেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ ও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ববোধকে উসকে দেয়।

এই ধারণা পরে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীদের জন্য এক ধরনের “বৈজ্ঞানিক অজুহাত” হয়ে দাঁড়ায়। তারা দাবি করত, এশিয়া, আফ্রিকা এবং প্যাসিফিক অঞ্চলের মানুষরা অনুন্নত এবং নিম্নস্তরের, তাই তাদের ওপর শাসন করা ইউরোপের নৈতিক দায়িত্ব। ডারউইনবাদী ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে ইউরোপীয় সেনাবাহিনী এসব অঞ্চলে সামরিক আগ্রাসন চালায়, জমি দখল করে এবং সম্পদ লুট করে। নিজেদের কর্মকাণ্ডকে তারা সভ্যতা নির্মাণ বলে দাবি করত অর্থাৎ বিবর্তনের সিঁড়ির নিচে থাকা জাতিগুলোকে নাকি তারা আধুনিক ও শিক্ষিত করে তুলছে। বাস্তবে এসব তত্ত্ব শুধুই উপনিবেশ বিস্তার, বর্ণবাদ ও বৈষম্যকে ন্যায্যতা দেওয়ার হাতিয়ার ছিল।

"কালো চামড়ার মানুষেরা নিম্নজাত এবং তুলনামূলক কম বিবর্তিত বিধায় অনুন্নত"-ডারউইনের এই চিন্তা ভিক্টোরিয়া-পূর্ববর্তী যুগে ব্যাপকতা লাভকরে, যা সাম্প্রদায়িকতাকে আরও উস্কে দেয় এবং এর মাধ্যমে প্রশস্ত হয় সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের পথ। ডারউইনের মতবাদ ইউরোপিয়ান সেনাবাহিনীকে এশিয়া, আফ্রিকা এবং প্যাসিফিকের বিস্তীর্ণ অনুন্নত অঞ্চলগুলোতে সামরিক অভিযান পরিচালনার একটা যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তৈরি করে দেয়। তারা সেসব অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, সেখানকার জনগোষ্ঠীকে হত্যা করে এবং তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে। প্রগতিশীল এ সাম্রাজ্যবাদীরা দাবি করে যে, তাদের এ দখলদারিত্বের মহান উদ্দেশ্য হলো বিবর্তনের সিঁড়ির নিচের ধাপে পড়ে থাকা এইসব পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত জাতিগুলোকে সভ্য ও শিক্ষিত করে গড়ে তোলা[২৫]।

---

[২৫]জেফরি গুডম্যান এর "দ্য জেনেসিস মিস্ট্রি" (টাইমস বুক, ১৯৮৩) বইটি এই দাবির সপক্ষে উদ্ধৃত হয়েছে "ক্লিংগিং টু আ মিথ" বইয়ের নবম পৃষ্ঠায়

৩.৭ পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক প্রভাব

পাশ্চাত্য দেশগুলো শুধু সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে নয়, অর্থনৈতিকভাবেও মুসলিম দেশগুলোতে গভীর প্রভাব ফেলেছে। পশ্চিমা অর্থনৈতিক নীতি, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং ঋণ-ঋণদানের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুসলিম দেশগুলো প্রায়শই তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।পশ্চিমা অর্থনৈতিক প্রভাব মূলত তিনটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়[২৬]:

1. **ঋণ ও ব্যাংকিং প্রভাব:** মুসলিম দেশগুলো উন্নয়নের নামে পশ্চিমা ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থার ঋণের ওপর নির্ভর করছে। এর ফলে দেশের অর্থনীতি বিদেশি নীতির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।
2. **বাণিজ্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণ:** পশ্চিমা দেশগুলো তাদের পণ্যের বাজার মুসলিম দেশে প্রসারিত করে। স্থানীয় শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে তারা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। এতে দেশীয় উৎপাদন ও স্বনির্ভর অর্থনীতি দুর্বল হয়।
3. **মূল্যবৃদ্ধি ও ধনাঢ্যতা কেন্দ্রীকরণ:** পুঁজিবাদী নীতি অনুসারে সম্পদ মূলত ধনীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। মুসলিম সমাজে এর প্রভাব পড়েছে, ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায় এবং গরিব জনগোষ্ঠী আরও অসহায় হয়ে পড়ে।

ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি সমাজে ন্যায়বিচার এবং দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য অপরিহার্য। ইসলামী অর্থনীতি যাকাত, সদকা ও ইনফাকের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখে।পাশ্চাত্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রভাবের ফলে মুসলিম দেশগুলোতে স্বনির্ভরতা কমে যাচ্ছে, শিক্ষার ধরন ও শিল্পায়ন পশ্চিমা মডেলের দিকে ধাবিত হচ্ছে।এই প্রভাব অনেক সময় আঞ্চলিক ও সামাজিক সমস্যা তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, স্থানীয় শিল্প হ্রাস পায়, কর্মসংস্থান কমে যায় এবং ঋণের বোঝা জনগণের ওপর চাপ তৈরি করে।ফলে, পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক প্রভাব শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, এটি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। মুসলিম সমাজের আত্মসম্মান, নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধান হলো, স্বনির্ভর অর্থনীতি, ন্যায়বিচারপূর্ণ বণ্টন ও বিদেশি ঋণের সীমাবদ্ধ ব্যবহার। পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক প্রভাব মুসলিম দেশগুলোতে স্বাধীনতা ও নৈতিকতার উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

---

[২৬]Hobson, J. A. (1902). Imperialism: A Study. London: James Nisbet & Co.

৩.৮ অশ্লীল শিল্পকলার প্রসার

পশ্চিমা সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হলো অশ্লীল বা যৌনপ্রবণ শিল্পকলার বিস্তার। চলচ্চিত্র, নাটক, গান, ফ্যাশন এবং অন্যান্য বিনোদনের মাধ্যমে এসব কনটেন্ট মুসলিম সমাজে প্রবেশ করছে। এসব শিল্পকর্ম প্রায়শই নৈতিকতা, পারিবারিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক শৃঙ্খলাকে দুর্বল করে।পশ্চিমা সমাজে অশ্লীল শিল্পকলাকে সৃজনশীলতা বা স্বাধীন অভিব্যক্তি হিসেবে দেখা হয়। তবে বাস্তবে, এটি মানুষকে সংবেদনশীলতা ও নৈতিকতার সীমা অতিক্রম করতে প্ররোচিত করে। মুসলিম সমাজে এই প্রভাব বিশেষভাবে যুবসমাজের ওপর বেশি দেখা যায়। তারা পরিচিতি, আধুনিকতা ও পশ্চিমা জীবনধারার সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে অনেক সময় ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়ম অবহেলা করে।ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, শরীর, মন এবং আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনে বলা হয়েছে,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ

“নিজেদের এবং অন্যদের প্রাধান্য দিয়ে পাপ থেকে বিরত থাকো।” (সূরা আন-নূর, ২৪:৩০-৩১)।

অশ্লীল শিল্পকলার বিস্তার এই নৈতিক বাধ্যবাধকতাকে দুর্বল করে। মানুষ মানসিকভাবে সংবেদনশীল হয়ে পড়ছে, আত্মশৃঙ্খলা হারাচ্ছে এবং সামাজিক সম্পর্কেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।পশ্চিমা অশ্লীল শিল্পকলার একটি লক্ষ্য হলো মৌলিক মানসিকতার পরিবর্তন। সমাজে ভোগবিলাসী জীবনধারাকে প্রচলিত করা, পারিবারিক বন্ধন দুর্বল করা এবং যৌনপ্রবণতার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করা। এতে যুবসমাজ সহজে প্রলোভনে পড়ে এবং নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য হারায়।ফলে, অশ্লীল শিল্পকলার প্রসার শুধুমাত্র বিনোদনের সীমায় সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি সৃষ্টি করে। পশ্চিমা লিবারেল আদর্শ এবং মিডিয়ার প্রভাব নারীর স্বাধীনতার নামে এক নতুন ধরণের শোষণ সৃষ্টি করেছে। নারীকে “ঘরের চারদেয়াল থেকে মুক্তি” দেওয়ার স্লোগানের আড়ালে আসলে তাকে বাজারে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে [২৭]। ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে নারীকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে যেন তার স্বাধীনতা শুধুই শরীর প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ফলে নারীর প্রকৃত পরিচয়-মমতা, দায়িত্ব, পরিবার গঠন এবং প্রজন্ম তৈরি,এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ধীরে ধীরে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

---

[২৭]Wolf, N. (1990). *The Beauty Myth.* HarperCollins.

পরিবার, যা সমাজের সবচেয়ে মৌলিক ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, তা দুর্বল হয়ে পড়েছে। নারী-পুরুষ উভয়ের ভূমিকা অস্পষ্ট হওয়ায় পরিবারিক স্থিতি নষ্ট হয়েছে। এর ফলস্বরূপ পারিবারিক শিক্ষা দুর্বল হয়েছে, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের কাঠামো ভেঙে পড়েছে। পরিবার ভেঙে যাওয়ার কারণে বেড়েছে বিবাহবিচ্ছেদ, পরকীয়া, গর্ভপাত, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস। শিশু-কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে; বাড়ছে অপরাধপ্রবণতা, মাদকাসক্তি, হতাশা ও আত্মহত্যার ঝুঁকি। পশ্চিমা সমাজে যে ধরণের নৈতিক ও পারিবারিক সংকট তৈরি হয়েছে, তার প্রভাব উপনিবেশ-উত্তর মুসলিম সমাজেও দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় সমাজগুলো পশ্চিমা সংস্কৃতিকে আধুনিকতা হিসেবে গ্রহণ করতে গিয়ে একই ধরণের পারিবারিক ভাঙন এবং নৈতিক সংকটে পড়ছে। ফলে পশ্চিমা মূল্যবোধের এই হাওয়া আমরাও অনুভব করছি এবং ধীরে ধীরে পশ্চিমা সমাজে দেখা একই প্যাটার্ন আমাদের সমাজেও পুনরাবৃত্ত হচ্ছে।

৩.৯ প্রচার মিডিয়ার উপর কর্তৃত্ব

পশ্চিমা দেশগুলো তাদের মিডিয়ার মাধ্যমে সমাজ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ব্যবহার করে। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, সিনেমা, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ধারণা, মূল্যবোধ এবং জীবনধারাকে প্রচার করে। মিডিয়া এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন আনছে।পশ্চিমা মিডিয়ার মূল লক্ষ্য হলো মানসিক প্রভাব বিস্তার করা। তারা মানুষকে নির্দিষ্ট ধরনের জীবনধারা, ভোগবিলাসী মনোভাব এবং পশ্চিমা চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত করায়। যুবসমাজ এই প্রভাব সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করে, কারণ তারা প্রযুক্তি ও বিনোদনের মাধ্যমে পশ্চিমা কনটেন্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকে।ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মিডিয়া শক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি সমাজের মানসিক ও নৈতিক ধারা প্রভাবিত করতে পারে। পশ্চিমা মিডিয়া প্রায়শই এই নৈতিক সীমারেখাকে অগ্রাহ্য করে, যা সামাজিক মূল্যবোধকে দুর্বল করে।পশ্চিমা মিডিয়ার প্রভাবের ফলে মুসলিম সমাজে ভোগবাদ, আভিজাত্য ও অহংবোধের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত বিজ্ঞাপন, সিনেমা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার কনটেন্ট মানুষের মনোভাব ও আচরণকে পশ্চিমা মানদণ্ডে মূল্যায়ন করে। এতে করে স্থানীয় সংস্কৃতি ও পরিবারিক মূল্যবোধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।ফলে, মিডিয়ার উপর পশ্চিমা কর্তৃত্ব শুধুমাত্র বিনোদন সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে। ইসলাম সমাজকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেয়। মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে সত্য ও ন্যায় প্রচার করা, অসৎ

প্রভাব থেকে নিজেকে এবং সমাজকে রক্ষা করা অপরিহার্য[৫]।মিডিয়ার উপর পশ্চিমা কর্তৃত্ব মুসলিম সমাজের মানসিক ও নৈতিক গঠনকে পরিবর্তন করছে।

৩.১০ জাতিসংঘ ও বিভিন্ন এনজিও-র ভূমিকা

পশ্চিমা দেশগুলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং এনজিওর মাধ্যমে মুসলিম দেশগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করছে। জাতিসংঘ, বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এবং বহুজাতিক এনজিওগুলো প্রায়শই উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার নামক প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজে প্রবেশ করে।এই প্রক্রিয়ায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবও বিস্তার করা হয়।আবারও লক্ষ্য করা যায়, এসব সংস্থার মূল লক্ষ্য প্রায়ই উন্নয়ন হলেও, বাস্তবে এটি পশ্চিমা নীতিমালা ও সংস্কৃতি প্রচারের একটি মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রকল্পে কখনও কখনও পশ্চিমা জীবনধারার প্রচার বা নৈতিকতার সীমারেখাকে চ্যালেঞ্জ করা লক্ষ্য করা যায়। যুবসমাজ এতে সহজেই প্রভাবিত হয়।ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, সাহায্য ও সহায়তা অবশ্যই ন্যায়, দায়িত্ব এবং মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে হওয়া উচিত।

কুরআনে বলা হয়েছে,

مَثَلُ الَّذِيۡنَ يُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَہُمۡ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنۡۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِىۡ كُلِّ سُنۡۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ‌ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنۡ يَّشَآءُ‌ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيۡمٌ

“যারা আল্লাহর পথে নিজেদের অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত এ রকম যেমন একটি শস্য দানা সাতটি শীষ উদগত করে (এবং) প্রতিটি শীষে একশ’ দানা জন্মায়। আর আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন (সওয়াবে) কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় (এবং) সর্বজ্ঞ” (সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৬১)।

অর্থাৎ সাহায্য প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত, কোনো রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য নয়।কিছু এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন আনছে।তারা মানবাধিকারের কথা বলে অথচ ফিলিস্তিনে যে গণহত্যা চলছে সেটা নিয়ে তারা কিছু বলতে পারছে না।বলবে কীভাবে!যারা এসব গণহত্যা চালাচ্ছে তারাই তো এসব এনজিও প্রতিষ্ঠা করেছে। “সব জায়গায় ধর্ম টেনে আনবেন না” এই ধরনের কথা সাধারণত এমনভাবে বলা হয় যেন ধর্ম একটি অপ্রাসঙ্গিক ও সমস্যাজনক বিষয়, যা সামাজিক বা রাজনৈতিক বাস্তবতা নষ্ট করে। কিন্তু এই বক্তব্য অনেকটা ইসরায়েলের প্রচারণার মতো, যারা নিজেদের আগ্রাসনকে আড়াল করতে শব্দের চাতুর্য ব্যবহার করে।

ফিলিস্তিনের ভূমি দখল, জনগণকে বাস্তুচ্যুত করা এবং দশকের পর দশক ধরে গণহত্যা চালানোর পরও ইসরায়েল দাবি করে, “আমাদের আত্মরক্ষার অধিকার আছে” যেন আক্রমণকারী ফিলিস্তিনিরা আর ভুক্তভোগী ইসরায়েল নিজেকে রক্ষা করছে।

বাস্তবতা হলো ইউরোপ থেকে আগত ইহুদিরা ফিলিস্তিনের জমি জোরপূর্বক দখল করেছে, মসজিদুল আকসা দখলে রেখেছে এবং নিরীহ মানুষ হত্যা করে নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এত অত্যাচারের পর যখন ফিলিস্তিনিরা নিজেদের মাটি, মসজিদ ও অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তখনই ইসরায়েল তাদেরকে উল্টো “সন্ত্রাসী” বলে দাবি করে এবং নিজের আগ্রাসনকে “আত্মরক্ষা” হিসেবে উপস্থাপন করে।

“সব জায়গায় ধর্ম আনবেন না” কথাটাও ঠিক একই ধরনের। এটি এমন একটি বক্তব্য, যা শব্দের কৌশলে বাস্তব সত্যকে উল্টে দেয়। মুসলিম সমাজে ধর্ম হলো পরিচয়ের মূল ভিত্তি, নৈতিকতার উৎস এবং সামাজিক ব্যবস্থার কেন্দ্র। সেখানে ধর্মের কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক নয়; বরং বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। ফলে এই উক্তিটি ইসরায়েলের প্রচারণার মতোই,যেখানে প্রকৃত সত্যকে আড়াল করে ভুক্তভোগীকে অপরাধী আর অপরাধীকে নির্দোষ হিসেবে দেখানো হয়।তারা যুবসমাজকে স্বাধীন চিন্তাভাবনা, পশ্চিমা মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি আকৃষ্ট করছে। এতে স্থানীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রভাব কমে যাচ্ছে।ফলে, জাতিসংঘ ও এনজিওর ভূমিকা শুধুমাত্র মানবিক সহায়তা বা উন্নয়ন নয়, এটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে।

৩.১১ পারিবারিক বন্ধন ছিন্নকরণ

পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম সমাজে পারিবারিক বন্ধনকেও দুর্বল করছে। পশ্চিমা জীবনধারা, ব্যস্ত জীবনশৈলী এবং ব্যক্তি কেন্দ্রিক মনোভাব পরিবারকে প্রভাবিত করছে।পশ্চিমা সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে পরিবারে পারস্পরিক সহযোগিতা, দায়িত্ববোধ এবং সম্মান কমে যাচ্ছে। যুবসমাজও প্রায়শই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষার পরিবর্তে বহির্বিশ্বের প্রভাব গ্রহণ করছে।ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার হলো সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। কুরআনে বলা হয়েছে,

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

"এবং আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর।" (সূরা আন-নিসা, ৪:৩৬)

পরিবারিক সম্পর্ক কেবল রক্তের সম্পর্ক নয়, বরং পারস্পরিক সহযোগিতা, দায়িত্ব এবং ভালোবাসার মাধ্যমে দৃঢ় হয়।পশ্চিমা প্রভাবের ফলে পরিবারে বিচ্ছিন্নতা, সন্তান ও অভিভাবকের মধ্যে দুরত্ব, এবং সংসারকে অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে দেখা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় যুবসমাজ পারিবারিক মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে।ফলে, পরিবার শুধুমাত্র বসবাসের স্থান নয়, নৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক পরিচয়ের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করতে পারছে না। ইসলামী দৃষ্টিতে পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় রাখতে অভিভাবক ও সন্তানদের মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্ব, ধর্মীয় শিক্ষা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ বজায় রাখা অপরিহার্য।পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হলেও, ইসলামী নীতি মেনে পরিবারকে শক্তিশালী করা সম্ভব। পারিবারিক শিক্ষা, সহমর্মিতা, আধ্যাত্মিকতা ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে পারিবারিক সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করা যায়।

৩.১২ সৌন্দর্য্যের বানিজ্যিক প্রদর্শনী ও ফ্যাশন শো সংস্কৃতি

পশ্চিমা সংস্কৃতির আরেকটি শক্তিশালী প্রভাব হলো সৌন্দর্য্যের বানিজ্যিকীকরণ এবং ফ্যাশন শো সংস্কৃতি। পশ্চিমা দেশগুলো তাদের ফ্যাশন, বিউটি প্রোডাক্ট, মেকআপ ট্রেন্ড এবং মডেলিং শিল্পের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে সৌন্দর্য্যের একটি নতুন মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছে[২৮]।ফ্যাশন শো, বিজ্ঞাপন এবং বিভিন্ন মিডিয়ার প্রচার এই ধারণা তৈরি করে যে, দেখার মতো সুন্দর হওয়া মানেই সমাজে গ্রহণযোগ্য ও সফল হওয়া। এতে বিশেষ করে যুবসমাজ প্রভাবিত হয়। তারা চাইছে নামি ব্র্যান্ড, ফ্যাশনেবল পোশাক এবং আধুনিক সৌন্দর্য্যের সাথে মানিয়ে নিতে।

পশ্চিমা সমাজে এই প্রক্রিয়াকে ব্যবসায়িক লাভের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সৌন্দর্য্য শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উপহার বা আত্মপ্রকাশ নয়, একটি পণ্য ও বাজারজাতকরণের উপাদান হিসেবে দেখা হয়। ফ্যাশন ও সৌন্দর্য্যকে বানিজ্যিকভাবে প্রচার করার ফলে যুবসমাজ মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রভাবিত হয়, আত্মসম্মান ব্যক্তির বাইরের চেহারার উপর নির্ভর করতে শুরু করে।ইসলামের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য্য হলো আল্লাহর প্রদত্ত একটি নৈসর্গিক দান।

---

[২৮]Wolf, N. (1990). The Beauty Myth. HarperCollins.

ফ্যাশন শো ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সৌন্দর্য্যকে শুধু বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা, মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

পশ্চিমা সৌন্দর্য্য সংস্কৃতি সমাজে তিন ধরনের প্রভাব ফেলেছে[২৯]:

১. **সামাজিক প্রভাব:** যুবসমাজের মধ্যে শারীরিক সৌন্দর্য্যের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ, আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব এবং সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক যেমন নৈতিকতা ও আত্মশৃঙ্খলা হ্রাস পেয়েছে।

২. **আর্থিক প্রভাব:** ফ্যাশন ও সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণ অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করেছে। মানুষ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ব্যয় করছে নামি ব্র্যান্ড, বিউটি প্রোডাক্ট এবং ফ্যাশন সামগ্রীতে।

৩. **সাংস্কৃতিক প্রভাব:** স্থানীয় সংস্কৃতি ও পরিধান রীতিকে প্রায়শই উপেক্ষা করা হচ্ছে। যুবসমাজ পশ্চিমা স্টাইলের সাথে মানিয়ে নিতে গিয়ে নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছে।

ফলে, সৌন্দর্য্যের বানিজ্যিকীকরণ শুধু বাহ্যিক নয়, মানসিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলছে। এটি মৌলিক নৈতিকতা, আত্মসম্মান এবং আধ্যাত্মিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ইসলামী দৃষ্টিতে সৌন্দর্য্যকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা, তা মানুষের নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির সাথে সংযুক্ত করা অপরিহার্য।সুতরাং, মুসলিম সমাজে ফ্যাশন শো ও সৌন্দর্য্য বানিজ্যিকীকরণের প্রভাব কমাতে হলে:

i. যুবসমাজকে নৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতার মাধ্যমে পরিচালিত করা,
ii. স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা,
iii. সৌন্দর্য্যকে সৎ ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা,
iv. এবং পারিবারিক ও ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া,

এগুলো কার্যকর উপায় হিসেবে কাজ করতে পারে। ইসলাম মানুষের সৌন্দর্য্যকে কেবল বাহ্যিক নয়, নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সমন্বয়পূর্ণভাবে মূল্যায়ন করতে শেখায়।ফলে, পশ্চিমা ফ্যাশন ও সৌন্দর্য্য সংস্কৃতি যেমন যুবসমাজকে প্রলোভিত করে, তেমনি এটি সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কাঠামোকে দুর্বল করে। ইসলামী নীতি মেনে যুবসমাজ ও সমাজকে সচেতন করা হলে এই প্রভাব মোকাবেলা করা সম্ভব।

---

[২৯]Baudrillard, J. (1998). The Consumer Society. Sage Publications

৩.১৩ পশ্চিমা দর্শনের মূল উৎস

ইউরোপের রেনেসাঁ (১৪৫৩-১৭৮৯ খ্রি.)

ইউরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুগ, যা আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তি তৈরি করে। এই সময়কে "নতুন জন্ম" বলা হলেও অনেক ইতিহাসবিদ এটিকে ধর্মবিরোধী আন্দোলনের যুগ বলে মনে করেন, কারণ এই সময় থেকেই রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের প্রভাব কমতে শুরু করে এবং ধর্মহীনতার চিন্তা মানুষের মনে জায়গা নেয়। তবে নাম নিয়ে তর্কের প্রয়োজন নেই; আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো এই যুগের পরিবর্তনগুলো আজকের বিশ্বরাজনীতি, পশ্চিমা শক্তির উত্থান এবং মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে পরিচালিত আধুনিক চক্রান্ত বুঝতে সাহায্য করে।

[৩০]রেনেসাঁর সূচনা ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর থেকে। এই বিজয়ের ফলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়, এবং বহু গ্রিক দার্শনিক, পণ্ডিত ও মুসলিম বিশ্বের শিক্ষাপ্রাপ্ত খ্রিষ্টানরা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে তারা ইতালিতে জড়ো হয়, তারপর সারা ইউরোপে আধুনিক জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়। মজার বিষয় হলো এই জ্ঞানের বড় অংশ মুসলিম সভ্যতা থেকেই নেয়া হয়েছিল; কিন্তু ইউরোপে গিয়ে সেগুলো ধর্মহীনতার ধারণার সঙ্গে মিশে নতুন ধারা তৈরি করে। এই ভাবধারা ইউরোপীয়দের মনোজগতে গভীর পরিবর্তন আনে এবং ধর্ম নিয়ে অসন্তুষ্টির ভিত্তিতে যুক্তিবাদী আন্দোলন, গির্জা সংশোধন, প্রটেস্টান্ট বিস্তার এবং পরবর্তীতে ফরাসি বিপ্লব পর্যন্ত গতি পায়।

এই সময়েই সবচেয়ে বড় ধর্মীয় পরিবর্তন ঘটে।মার্টিন লুথারের প্রটেস্টান্ট আন্দোলন সফল হয় এবং খ্রিষ্টান ধর্মে একটি নতুন গোষ্ঠী তৈরি হয়, যারা পরবর্তীতে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আমেরিকার আবিষ্কারও এই সময় ঘটে, এবং পরবর্তীতে আমেরিকাই হয়ে ওঠে প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের নিরাপদ ঘাঁটি। এখান থেকেই জন্ম নেয় প্রথম ধর্মহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, যা পরে বিশ্বব্যাপী সেক্যুলারিজমের ভিত্তি তৈরি করে।

রেনেসাঁ যুগে ইউরোপীয় দেশগুলো ব্যবসার নামে ভারতবর্ষে কোম্পানি পাঠায়, যেগুলো পরবর্তীতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দখলের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই উত্থানই পশ্চিমাদের বিশ্বশক্তি হওয়ার মূল ধাপ। একই সময়ে ব্যাংক, কাগুজে নোট ও পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বিস্তার ঘটে যা আজকের মার্কেট-ভিত্তিক আমেরিকান অর্থনীতির ভিত্তি।

---

[৩০]Setton, K. M. (1955–1989). *A History of the Crusades* (Vol. 1–6). University of Wisconsin Press.

৩০এর পাশাপাশি ইউরোপেই ঘটে ৩০ বছরের ভয়াবহ যুদ্ধ, যা ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়। এই চুক্তিই আধুনিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা সৃষ্টি করে যার ওপর আজকের জাতিসংঘ রাষ্ট্রসীমা নির্ধারণ ও রাষ্ট্রস্বীকৃতির নিয়ম দাঁড়িয়ে আছে।

রেনেসাঁ যুগের সবচেয়ে গভীর পরিবর্তন ছিল মানুষের চিন্তা–চেতনায়। ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্টি, যুক্তিবাদ, গির্জা-বিরোধিতা এবং ধর্মীয় কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এক নতুন মানসিক বিপ্লব তৈরি করে। ধর্মহীনতার এই ধারা ধীরে ধীরে ইউরোপকে ঘিরে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত ফরাসি বিপ্লবে গিয়ে তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। আজকের সেক্যুলারিজম, লিবারেলিজম, মানবতাবাদ ও আধুনিক পশ্চিমা রাজনৈতিক তত্ত্বগুলোর মূল শেকড় এই রেনেসাঁ যুগেই।

মুসলিমদের জন্য এই যুগটি বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ মুসলিম বিশ্বের ধর্মহীন গোষ্ঠীগুলো প্রায়ই দাবি করে,ইউরোপ উন্নত হয়েছে ধর্মহীনতার কারণে। তারা পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা, দর্শন এবং আদর্শকে অন্ধভাবে অনুসরণ করার পরামর্শ দেয়। অথচ বাস্তবে দেখা যায় মুসলিমদের পতনের অন্যতম কারণ ছিল নিজেদের দৃঢ় ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা ত্যাগ করে সেই পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করা, যা রেনেসাঁর যুগেই ধর্মবিরোধী চিন্তা যোগ করে তৈরি হয়েছিল। তাই এই যুগের ইতিহাস বুঝলে পরিষ্কার হয়,ইউরোপের অগ্রগতির মূল ছিল বিজ্ঞান, সংগঠন ও সামরিক শক্তি; কিন্তু এর সঙ্গে ধর্মহীনতাকে সফলতার একমাত্র কারণ বলা ভুল ও বিভ্রান্তিকর ধারণা।

পশ্চিমাদের বিকৃত চিন্তাধারাগুল মূলত শুরু হয় ইউরপীয় রেনেসাঁর পর থেকে খ্রিষ্টধর্ম যখন ইউরোপে শক্তিশালী হলো, তখন পুরনো গ্রেকো–রোমান পৌত্তলিকতা ধীরে ধীরে তার প্রভাব হারায়। কিন্তু রেনেসাঁ সেই হারানো পৌত্তলিকতার এক নতুন রূপে ফিরে আসা। রেনেসাঁ মূলত প্রকৃতিপূজা, মানবকেন্দ্রিকতা এবং গ্রেকো–রোমান দর্শনের পুনর্জন্ম যার কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষ, ক্ষমতা ও ভোগবাদ। আজ পশ্চিমা সমাজে যে নৈতিক অবক্ষয়, মূল্যবোধের পতন এবং পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার ঘটনা আমরা দেখি, তার শিকড় এই রেনেসাঁ-জনিত চিন্তাধারার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। মডারেট বা সংস্কারপন্থী মুসলিমরা প্রায়ই এই পশ্চিমা অবক্ষয়ের সমালোচনা করেন, কিন্তু এ কথা ভুলে যান যে রেনেসাঁর এই আদর্শই একসময় ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের ধর্মীয় ভিত্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। যে শক্তি দু'টি পূর্ববর্তী ধর্মকে cultural ও intellectual পর্যায়ে পরাজিত করেছে, সেই শক্তিই আজ ইসলামের ওপর আদর্শগত হুমকি সৃষ্টি করছে।বিশ্বব্যাপী যে ধর্মনিরপেক্ষতা ও লিবারেল মতবাদ প্রচারিত হচ্ছে এবং যা গত একশ বছর ধরে মুসলিম সমাজে

চিন্তা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অস্থিরতা তৈরি করেছে তার উৎসও রেনেসাঁ এবং পরবর্তী ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্ট। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিমদের একটি বড় অংশ এই হুমকিকে গুরুত্ব দেন না। কেউ কেউ মনে করেন ইসলাম যেহেতু শক্তিশালী আদর্শিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তাই পশ্চিমা লিবারেল মূল্যবোধ ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ফলে পশ্চিমা চিন্তার এই ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন অনেক মুসলিমের দৃষ্টিতে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। অথচ বাস্তবে রেনেসাঁ-উদ্ভূত সেক্যুলারিজম ও লিবারেলিজমই আজ মুসলিম সমাজের বিশ্বাস, পরিচয়, পরিবার, শিক্ষা ও নৈতিকতার ওপর সবচেয়ে বড় আদর্শিক আঘাত হিসেবে কাজ করছে।

[৩১]নরওয়ের উগ্র সন্ত্রাসী আন্দেরস ব্রেইভিকের দৃষ্টিতে ইসলাম হচ্ছে পশ্চিমা সভ্যতার সবচেয়ে বড় হুমকি। তার বিশ্বাস অনুযায়ী, ফেমিনিজম ও মাল্টিকালচারালিজম পশ্চিমকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দিচ্ছে এক ধরনের "সামাজিক ক্যান্সার" হিসেবে। ব্রেইভিক মনে করত, ইউরোপকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হলো মুসলমানদের ইউরোপ থেকে বের করে দেওয়া এবং ফেমিনিজম ও বহুসাংস্কৃতিকতার সমর্থকদের সম্পূর্ণভাবে দমন করা। সে নিজেকে দেখত এক ধরনের আত্মোৎসর্গকারী বিপ্লবী হিসেবে, যে সংকটময় সময়ে স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে ইউরোপের ভবিষ্যৎ রক্ষায় লড়াই করছে। তার মতে, সে ক্রুসেডারদের উত্তরসূরি একজন আধুনিক নাইট টেম্পলার, যে ইসলামের বিস্তার ও পশ্চিমা সংস্কৃতির অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেকে উৎসর্গ করেছে।

আদালতে বিচার চলাকালীন সময়েও ব্রেইভিক বারবার বলেছে, তার হামলা এবং তার লেখা ১৫০০ পৃষ্ঠার ম্যানিফেস্টো একদিন ঘৃণিত মনে হলেও ভবিষ্যতে অনেকেই এটিকে সমর্থন করে সাহসী সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখবে। সে আশা করেছিল যে তার মতো বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সাদা উগ্রবাদীরা এই হামলা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও সক্রিয় হবে এবং তার মতোই প্রতিরোধ শুরু করবে।

দুঃখজনকভাবে, তার আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। ইউরোপ ও আমেরিকায় পরবর্তী বছরগুলোতে যে চরম ডানপন্থী হামলা, মুসলিমবিরোধী সহিংসতা, এবং "শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী" আন্দোলনের উত্থান দেখা যায় তার মধ্যে ব্রেইভিকের চিন্তা ও প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। তার ম্যানিফেস্টো ও ধারণাগুলো বিশ্বজুড়ে উগ্র ডানপন্থীদের জন্য এক ধরনের অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে, যা পশ্চিমা সমাজে ইসলামভীতি, বর্ণবাদ ও সন্ত্রাসী ভাবধারাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

---

[৩১]*Breivik, A. B. (2011).* 2083: A European Declaration of Independence

হিউম্যানিজম মানবতাবাদ বা মানবধর্ম

রেনেসাঁর সময় থেকে পশ্চিমা দুনিয়ায় একটি বড় ধরনের চিন্তাগত পরিবর্তন শুরু হয়, যা ধীরে ধীরে হিউম্যানিজম বা মানবধর্ম নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। এই ধারণার মূল শিকড় পাওয়া যায় গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে, যারা মনে করত মানুষ নিজের বুদ্ধি দিয়ে দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধান করতে পারে। প্রথমে তারা সূর্য, চন্দ্র, তারা এগুলো নিয়ে যুক্তিভিত্তিক গবেষণা করত; পরে তারা দাবি করতে থাকে যে মানুষের সামাজিক জীবন, নৈতিকতা, রাজনীতি এসব পরিচালনার ক্ষেত্রেও ধর্ম বা কোনো স্রষ্টার নির্দেশনার প্রয়োজন নেই। মানুষের বুদ্ধিই সবকিছু নির্ধারণ করবে এই ধারণাই হিউম্যানিজমকে শক্ত ভিত্তি দেয়।

[৩২]এর আগে খ্রিষ্টান পাদরি সেন্ট অগাস্টিন এই চিন্তাকে দমন করেছিলেন, ফলে হাজার বছর এটি নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু মধ্যযুগের শেষ দিকে এবং রেনেসাঁর সময় এটি আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। ধর্মীয় নেতাদের দুর্নীতি ও ভুল ব্যাখ্যার কারণে সাধারণ মানুষ ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে দার্শনিকরা মানুষকে বোঝাতে শুরু করে যে মানুষ এত উন্নত হয়েছে যে তাকে আর ধর্ম বা সৃষ্টিকর্তার ওপর নির্ভর করতে হবে না।[৩৩]আধুনিক হিউম্যানিজমকে গড়ে তোলে জন লক, ডেভিড হিউম, ভলতেয়ার, নিৎশে এবং রুশোর মতো দার্শনিকরা। তারা একধরনের বুদ্ধিপূজাবাদ প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে মানুষই নিজের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। তাদের বক্তব্য ছিল,মানুষ স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নিজের ইচ্ছার ওপর সম্পূর্ণ অধিকার রাখে। ধর্ম, নৈতিকতা, পরিবার বা রাষ্ট্র কোনোভাবেই মানুষের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না। এই ধারণা থেকে সমাজ, রাষ্ট্র ও ন্যায়বিচারের নতুন ব্যাখ্যা তৈরি হয়। বলা হয় মানুষের সম্মিলিত সিদ্ধান্তই হলো আইন। কোনো ইলাহি বিধানের প্রয়োজন নেই। ধর্মীয় নৈতিকতার পরিবর্তে তারা প্রস্তাব করে মানবিক নৈতিকতা, যা আসলে মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ দ্বারা গঠিত। তারা এমন ধারণাও দেয় যে ইতিহাস নতুন করে লেখা উচিত ,এভাবে লেখা উচিত, যাতে প্রতিটি সভ্যতার মূল্যায়ন হবে মানুষের চাহিদা ও সুখ কতটা পূরণ করেছে তার ভিত্তিতে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। ধর্মীয় ইতিহাসকে ভুল ও বিকৃত বলা হয়, আর নতুন ইতিহাসে মানুষকে সর্বোচ্চ সত্তা হিসেবে তুলে ধরা হয়।

---

[৩২]Augustine, The City of God*,* Book V & VIII.

[৩৩]Locke, J. (1689). An Essay Concerning Human Understanding

হিউম্যানিস্টদের চিন্তায় মানুষ আল্লাহর বান্দা নয় বরং নিজেই নিজের মালিক। তার ওপর কোনো ছায়া কর্তৃত্ব নেই। তাই হিউম্যান হওয়ার শর্তই হলো স্রষ্টার ধারণাকে অস্বীকার করা। এইভাবে হিউম্যানিজম ধীরে ধীরে শুধু ধর্মের বিরোধিতা নয়; বরং একটি বিকল্প ধর্মে পরিণত হয় যেখানে মানুষই নিজের রব, নিজের ইলাহ। রেনেসাঁর পর ইউরোপের জনগণ নিজেদের এই হিউম্যান পরিচয়ে গর্ববোধ করতে শুরু করে এবং গির্জার পরিবর্তে দার্শনিকদের অনুসরণ করা শুরু করে। তাদের কথাই হয়ে ওঠে নতুন নৈতিকতা ও নতুন বিশ্বাসব্যবস্থা।

এই চিন্তার আরও একটি বড় পরিবর্তন ঘটে শিক্ষাব্যবস্থায়। গির্জা-কেন্দ্রিক ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে তারা শিশুদের পাঠাতে শুরু করে আধুনিক স্কুলে, যেখানে শেখানো হতো ধর্মহীন বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, বক্তৃতা ও কলা। এই শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণভাবে বস্তুবাদী এবং নতুন মানবধর্মের বাহক। এর লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় মূল্যবোধকে অপ্রাসঙ্গিক করে ফেলা এবং মানুষকে এমনভাবে গড়ে তোলা, যাতে সে কোনো বিধিনিষেধ ছাড়া নিজের ইচ্ছাকে সর্বোচ্চ মানদণ্ড মনে করে। ধীরে ধীরে এ শিক্ষাব্যবস্থা সেক্যুলারিজম, লিবারেলিজম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং পশ্চিমা নৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি তৈরি করে।

এভাবে রেনেসাঁ থেকে আধুনিক সময়ে পশ্চিমা সমাজে যে চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত হয়, তা মূলত মানুষের বুদ্ধিকে স্রষ্টার জায়গায় বসানোর প্রয়াস। পশ্চিমা সেক্যুলারিজম, লিবারেলিজম, মানবাধিকারের ব্যাখ্যা, ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণা সবই হিউম্যানিজমের শিকড় থেকে জন্ম নেয়। এই চিন্তা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করলে স্বাভাবিকভাবেই সংঘাত সৃষ্টি হয়, কারণ ইসলাম মানুষকে আল্লাহর বান্দা হিসেবে দেখে; আর হিউম্যানিজম মানুষকে আল্লাহর জায়গায় বসিয়ে দেয়।

ইউরোপে যুক্তিবাদের যুগ

ইউরোপে যুক্তিবাদের যুগ (Rationalism) মূলত রিফরমেশন আন্দোলনের পর শুরু হয়েছিল[৩৪]। কিন্তু এই ধারণার শেকড় রিফরমেশন আন্দোলনের দিকে গিয়ে ঠেকে। খ্রিষ্টান ধর্মে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা বিভ্রান্তি, পাদরিদের স্বেচ্ছাচারিতা ও ধর্মীয় দুর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষের মাঝে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। বাইবেল ব্যাখ্যার দায়িত্ব গির্জার হাতে না রেখে যখন সাধারণ মানুষের কাছে খুলে দেওয়া হলো, তখন অনেকে ধর্মের মূল সূত্রগুলোকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে দেখা শুরু করল।

---

[৩৪]MacCulloch, D. (2003). Reformation: Europe’s House Divided. Penguin.

ধীরে ধীরে তারা মনে করতে লাগল-ধর্ম নয়, মানুষের নিজের বুদ্ধিই সত্য–মিথ্যার একমাত্র বিচারক। এই সময় ইউরোপের অনেক দার্শনিক ও বিজ্ঞানী যুক্তিকে সর্বোচ্চ মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। ডেকার্ট, স্পিনোজা, লিবনিজ এবং জন লকের মতো চিন্তাবিদরা দাবি করতে শুরু করলেন যে মানববুদ্ধির বাইরে কোনো জ্ঞানের উৎস গ্রহণযোগ্য নয়[৩৫]। এমনকি তারা ধর্মীয় বিশ্বাস, আসমানি বিধান, নৈতিকতা সবকিছুকেই মানুষের যুক্তির আলোকে মাপতে চাইলেন। ফলে বিকৃত ও মতভেদপূর্ণ ইনজিলের প্রতিটি কথা সন্দেহের চোখে দেখা শুরু হয়। ধর্মের কোনো নির্দেশ বা শিক্ষা যদি যুক্তির সঙ্গে না মেলে, তা অস্বীকার বা বাতিল করে দেওয়াই নিয়ম হয়ে ওঠে।এই যুক্তিবাদের চিন্তা দ্রুত সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। গির্জা যেসব ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি শত শত বছর ধরে ধরে রেখেছিল, সেগুলো একে একে ভেঙে পড়তে থাকে। মানুষ পাদরিদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দার্শনিকদের অনুসরণ শুরু করে। জ্ঞান, নৈতিকতা, জীবনের উদ্দেশ্য এসবের উত্তর তারা ধর্মে নয়, বিজ্ঞান ও দর্শনে খুঁজতে থাকে। এর ফলে মানববুদ্ধি হয়ে ওঠে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব, আর যুক্তির বিরোধী যেকোনো কিছুকেই অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক হিসেবে বাতিল করা হয়।

এই সময়ের মানুষ ধীরে ধীরে এমন ধারণা তৈরি করে যে, তারা আর আল্লাহর সৃষ্টি নয় বরং নিজেরাই তাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী ও সৃষ্টিকর্তা। অর্থাৎ মানুষ নিজেকে বান্দা হিসেবে দেখা বন্ধ করে দেয় এবং নিজের বুদ্ধি ও কামনাকে পূর্ণ স্বাধীনতার কেন্দ্রবিন্দুতে বসিয়ে ফেলে। রেনেসাঁর পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এই যুক্তিবাদী চিন্তা ইউরোপীয় সমাজকে ধর্ম থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয় এবং পরে জন্ম নেয় সেক্যুলারিজম, লিবারেলিজম ও বস্তুবাদী নৈতিকতা।

ইউরোপে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উত্থান ও উন্নতি

রেনেসাঁর সময় ইউরোপে যেমন চিন্তাধারায় বড় পরিবর্তন আসে, তেমনি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেও একটি গভীর বিপ্লব ঘটে। এর প্রধান কারণ ছিল গির্জা, বাদশাহ ও জাগিরদার ব্যবস্থার শত বছরের শোষণ। গির্জার শিক্ষা ছিল আত্মীয়তার বন্ধন, নৈতিকতা, সত্যবাদিতা ও সমাজের কল্যাণ; কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল গির্জার পাদরি ও শাসকশ্রেণিই জনগণের সম্পদ লুট করে ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসে ব্যবহার করছে। তাদের আচরণ ধর্মের নৈতিকতার সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক হয়ে পড়েছিল। ফলে সাধারণ মানুষের মনে গির্জার প্রতি হতাশা ও ক্ষোভ জন্মায়। এই অসন্তোষই

[৩৫] Locke, J. *The Reasonableness of Christianity* (1695).

মানুষকে ধর্মবিরোধী ও বস্তুবাদী ধারণার দিকে ধাবিত করে এবং তারা এমন অর্থনৈতিক ধারণা গ্রহণ করা শুরু করে, যা গির্জার শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এই পরিবর্তনের আরেকটি বড় কারণ ছিল চতুর্দশ শতাব্দীর ভয়াবহ মহামারি 'ব্ল্যাক ডেথ'[৩৬]। এই মহামারিতে ইউরোপের বিপুল জনগোষ্ঠী মারা যায়, শ্রমিকের সংখ্যা কমে যায় এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় বড় সংকট দেখা দেয়। বেঁচে থাকা মানুষজন গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হতে থাকে, আর শহরের মানুষ নতুন বাজার ও নতুন ভূমির সন্ধানে ভারতবর্ষ (হিন্দুস্থান), আফ্রিকা ও আমেরিকার দিকে যাত্রা শুরু করে। ইউরোপীয় প্রশাসনও এই সুযোগে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কোম্পানি পাঠাতে থাকে, যা পরবর্তীতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে এবং উপনিবেশ স্থাপনের পথ তৈরি করে দেয়।

এর পাশাপাশি প্রটেস্টান্ট রিফরমেশন আন্দোলন খ্রিষ্টান সমাজে নতুন একটি চিন্তা নিয়ে আসে দুনিয়াবাদ ও বস্তুপূজার ধারণাকে ধর্মীয়ভাবে বৈধতা দেওয়া হয়। পূর্বে গির্জা ধন-সম্পদ জমা করাকে নিরুৎসাহিত করলেও প্রটেস্টান্টদের হাতে এটি বৈধতা পায়। বাদশাহ ও ধনীদের সম্পদ বৃদ্ধি এখন আর ধর্মীয় বাধার মুখে পড়েনি। ফলে বস্তুগত সাফল্যকে নৈতিকতা ও ধর্মের ওপরে স্থান দেওয়া শুরু হয়। এই তিন কারণ একত্রে ইউরোপকে এমন একটি অর্থনৈতিক দর্শনের দিকে ঠেলে দেয়, যেখান থেকে পুঁজিবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

পুঁজিবাদের মূল নীতি হলো মানুষ নিজের ব্যক্তিগত লাভ ও ইচ্ছাপূরণের জন্য কাজ করে, এবং এই লাভের আকাঙ্ক্ষাই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থই সমাজের সমষ্টিগত উন্নতির মূল শক্তি। এই চিন্তা অনুসারে মানুষ যত বেশি পুঁজি জমা করবে এবং যত বেশি ব্যবসা বা উৎপাদনে অংশ নেবে, সমাজ তত উন্নত হবে। পুঁজিবাদের মতে, জীবনের সর্বোচ্চ সাফল্য হলো সম্পদ বৃদ্ধি এবং সম্পদের সঞ্চয়। এ লক্ষ্যে মানুষকে স্বাধীনভাবে উৎপাদন, ব্যবসা, বিনিয়োগ সবই করার অনুমতি দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ যত কম হবে, ব্যবসা ও প্রতিযোগিতা তত বৃদ্ধি পাবে এবং পুঁজি প্রবাহ আরও সহজ হবে।

এই দর্শন অনুযায়ী সমাজকে গড়ে তুলতে হলে এমন একটি ব্যবস্থা প্রয়োজন হয় যেখানে ট্যাক্স কম থাকবে, সরকারি নিয়ন্ত্রণ কম থাকবে, এবং অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হবে। মুক্ত বাজারের এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রত্যেকে নিজের লাভের জন্য কাজ করবে, আর তার ফলেই দ্রুত শিল্পোন্নতি ঘটবে।

---

[৩৬]Herlihy, David (1997). *The Black Death and the Transformation of the West*. Harvard University Press

এই ধারণা থেকেই জন্ম নেয় ফ্রি মার্কেট বা স্বাধীন বাণিজ্যব্যবস্থা। এই অর্থনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতেই ইউরোপে প্রতিষ্ঠা পায় বড় বড় কোম্পানি, ব্যাংক এবং কাগুজে মুদ্রা বা পেপার কারেন্সি। এই তিনটি প্রতিষ্ঠান;কোম্পানি, ব্যাংক ও কারেন্সি ,পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে দেয় এবং পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী পশ্চিমা অর্থনৈতিক আধিপত্যের দরজা খুলে দেয়।

এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন ও আমেরিকায় বিপ্লব

ইউরোপে যে এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা অল্প সময়ের মধ্যেই বইয়ের মাধ্যমে আমেরিকায় পৌঁছে যায়। আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রায় সব নেতাই এই নতুন চিন্তার গভীর প্রভাবের অধীনে ছিলেন। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ও থমাস জেফারসনের মতো ব্যক্তিরা যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ধর্মহীন রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণাকে নিজেদের রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি বানান। ১৭৬২ থেকে ১৭৭৪ সালের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার আমেরিকার উপনিবেশগুলোতে ধারাবাহিকভাবে নতুন নতুন কর আরোপ করতে থাকে চা, চিনি ও সম্পদের ওপর আরোপিত ট্যাক্স জনগণকে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে[৩৭]। ইংরেজদের এই অতিরিক্ত কর আরোপকে আমেরিকানরা স্পষ্ট জুলুম হিসেবে দেখত। প্রথমে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ হলেও ধীরে ধীরে তা পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপ নেয়। আমেরিকানরা একটি মহাদেশীয় সেনাবাহিনী গঠন করে এবং এর সর্বাধিনায়ক হন জর্জ ওয়াশিংটন, যিনি পরে আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট হন।

স্বাধীনতার দাবিকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিতে “ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেন্ডেন্স” ঘোষণা করা হয়[৩৮]। এই ঘোষণা লেখেন থমাস জেফারসন। তাঁর বক্তব্য ছিল এটি কোনো মৌলিক রচনা নয়, বরং এনলাইটেনমেন্ট যুগের দার্শনিকদের ধারণাগুলো তিনি একত্র করে লেখায় রূপ দিয়েছেন। এই দলিলের মাধ্যমেই বিশ্বের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি ধর্মহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে রাষ্ট্রের ভিত্তি হলো মানুষের স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং যুক্তিবাদ, ধর্মীয় কর্তৃত্ব নয়।এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের সবচেয়ে নাটকীয় ও গভীর প্রভাব দেখা যায় ফরাসি বিপ্লবে। ইংরেজ বিপ্লব ও আমেরিকান বিপ্লবের পর ফরাসি বিপ্লব ছিল রেনেসাঁর যুগের শেষ বড় ঘটনা, যার মধ্য দিয়ে ইউরোপে পুরাতন বিশ্বব্যবস্থা বা ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডারের পতন ঘটে।

---

[৩৭]Kramnick, Isaac (Ed.) (1995). The Portable Enlightenment Reader.

[৩৮]Maier, Pauline (1997). American Scripture: Making the Declaration of Independence.

১৭৮৯ সালের বিপ্লবকে সাধারণত ধর্মীয় কর্তৃত্ব, গির্জার আধিপত্য এবং বাদশাহি শাসনের ওপর সর্বশেষ আঘাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর পর থেকে ইউরোপে ধর্মহীন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক সংবিধান, মানবিক স্বাধীনতার ধারণা এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

ফরাসি বিপ্লবের পেছনে বাহ্যিক কারণ ছিল জনগণের ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ এবং বাদশাহি শাসকদের বিলাসবহুল জীবনযাপন। সে সময় ফ্রান্সে বাদশাহ লুই ষোড়শের শাসন চলছিল। ১৭৮৮ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে জনগণ ক্ষতিপূরণ দাবি করে এবং ট্যাক্স কমানোর অনুরোধ জানায়; কিন্তু বাদশাহ এসব দাবির তোয়াক্কা করেননি। বরং তাঁর পরিবার এবং রাজকর্মচারীরা আরও বিলাসী জীবনযাপন করতেই ব্যস্ত ছিল। এরই মধ্যে ফ্রান্স এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে; সেখানে দার্শনিক, লেখক ও চিন্তাবিদরা ধর্মহীনতা, গণস্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের দাবি তুলতে থাকেন। জনআন্দোলন ও দার্শনিক প্রভাব পরস্পর মিলিত হয়ে জনগণকে বিপ্লবে প্ররোচিত করে[৩৯]।

ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইউরোপ শতাব্দী ধরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় ও সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে ভেঙে নতুন এক বিশ্বব্যবস্থায় প্রবেশ করে। এই পরিবর্তন শুধু ইউরোপে নয়, পরবর্তীকালে সারা পৃথিবীতে গভীর প্রভাব ফেলে। জাতিরাষ্ট্র, গণতন্ত্র, সেক্যুলার আইন, জাতীয়তাবাদ, মানবাধিকার সব আধুনিক ধারণার ভিত্তি তৈরি হয় এই এনলাইটেনমেন্ট-প্রভাবিত বিপ্লবগুলোর মাধ্যমে।

৩.১৪ পশ্চিমাদের উপর পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব

পশ্চিমা বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে প্রযুক্তি, চিকিৎসা, গবেষণা ও শিল্পক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। কিন্তু তাদের সামাজিক বিজ্ঞান ও সামাজিক কাঠামো একইভাবে সফল হয়নি বরং বহু ক্ষেত্রে ব্যর্থতার প্রমাণ দেখা যায়। পশ্চিমা সমাজ দীর্ঘদিন ধরে গভীর নৈতিক ও সামাজিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পরিবার, যা সমাজের সবচেয়ে মৌলিক ও মূল্যবান ইউনিট, তা দ্রুত ভেঙে পড়ছে। বিবাহবিচ্ছেদ বাড়ছে, পরকীয়ার হার বেড়ে গেছে, এবং বিপুল সংখ্যক শিশু জন্ম নিচ্ছে বিয়ের বন্ধন ছাড়াই। লক্ষ লক্ষ গর্ভস্থ শিশুকে প্রতি বছর আইনগতভাবে গর্ভপাতের নামে হত্যা করা হচ্ছে।

---

[৩৯]Schama, Simon (1989). *Citizens: A Chronicle of the French Revolution*.

একই সঙ্গে মাদকের ব্যবহার ভয়াবহভাবে বাড়ছে। জনপ্রিয় সংস্কৃতি বিশেষ করে পর্নোগ্রাফি, মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি এবং যৌনতামুখী মিডিয়া সমাজে বিকৃত যৌন আচরণের স্বাভাবিকীকরণ ঘটাচ্ছে। সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন ও অন্যান্য আচরণগত বিপর্যয় এখন শুধু গ্রহণযোগ্যই নয়, বরং উৎসাহিত ও উদযাপিত হচ্ছে। এসব পরিবর্তন পশ্চিমা সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে আরও দুর্বল করে তুলছে।

পরিবার ভেঙে পড়ার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিশুরা। পিতামাতার স্নেহ, সঠিক দিকনির্দেশনা এবং স্থির পরিবারিক পরিবেশের অভাবে লাখ লাখ শিশু-কিশোর বড় হচ্ছে মানসিক শূন্যতা, হতাশা, একাকিত্ব ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা নিয়ে। অনেকের জীবনে প্রভাব পড়ছে পড়াশোনা, আচরণ, আর্থিক জীবন এবং ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে। শক্তিশালী পরিবার ও সঠিক নৈতিক শিক্ষা না পাওয়ায় তারা মানবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে অক্ষম হয়ে পড়ছে এবং মাদক, উচ্ছৃঙ্খলতা, সহিংসতা ও মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে।

সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমা সভ্যতার সামাজিক কাঠামো ভেতর থেকে ধসে পড়ছে, এবং এই ধস মূলত পরিবারবিরোধী নীতিমালা, ধর্মহীনতা, অতিরিক্ত স্বাধীনতা এবং ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফল।

৩.১৫ পশ্চিমা প্রভাবের জন্য মুসলিম উম্মাহর পতন

পশ্চিমাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ দুটি বড় ভুল করেছে, যার প্রভাব আজও আমাদের ওপর কাজ করছে[৪০]। প্রথম ভুলটি ঘটেছিল উসমানি সাম্রাজ্যের শেষ সময়ে। তখন মুসলিম সভ্যতা দুর্বল হয়ে পড়ছিল, আর ইউরোপ এনলাইটেনমেন্ট, উপনিবেশবাদ ও শিল্পবিপ্লবের কারণে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল[৪১]। অর্থনীতি, রাজনীতি, সামরিক শক্তি ও জ্ঞানে তারা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই সময় পশ্চিমা আগ্রাসনের মোকাবিলায় আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম পশ্চিমা সভ্যতা সম্পূর্ণই ভুল, তাই তা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা উচিত। ফলে আমরা ভালো-মন্দ বিচার করা থেকে বিরত থাকলাম। তাদের অগ্রগতি থেকে শেখার বদলে আমরা সবকিছুই অস্বীকার করলাম। যদিও আমাদের পতনের মূল কারণ ছিল তাওহিদ থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং জাতিগত বিভক্তি, তবুও পশ্চিমের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়

[৪০]Cleveland, William L. & Bunton, Martin (2016) – *A History of the Modern Middle East*
[৪১]Hobsbawm, Eric (1962) – *The Age of Revolution: 1789–1848*

ব্যর্থতাও বড় ভূমিকা রেখেছে। এই ব্যর্থতার ফলেই অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলিম ভূমিগুলো পশ্চিমাদের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

দ্বিতীয় ভুলটি ছিল প্রথম ভুলের বিপরীত প্রতিক্রিয়া। পরাজয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আত্মবিশ্বাসকে ভেঙে দেয়। আমরা যখন বুঝতে পারলাম যে আমরা পিছিয়ে পড়েছি, তখন পশ্চিমকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে শুরু করলাম। পশ্চিমা শক্তির ভয়ঙ্কর সামরিক ও প্রযুক্তিগত শক্তিকে আমরা তাদের আদর্শিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করলাম। তাই এবার আমরা আর তাদের প্রত্যাখ্যান করলাম না, বরং তাদের নিরঙ্কুশ অনুসরণ শুরু করলাম। পশ্চিমের শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, দর্শন, এমনকি পোশাকও আমরা প্রশ্ন ছাড়াই গ্রহণ করতে লাগলাম। বিশ্লেষণ বা মূল্যায়ন না করে নিজেদেরকে পশ্চিমের অনুকরণে সাজাতে থাকলাম।

প্রথম ভুলের ফল ছিল মুসলিম সভ্যতার পতন। দ্বিতীয় ভুলের ফল হলো এই পরাজিত অবস্থার দীর্ঘায়ন। আজও আমাদের অনেকেই পরাজিত অবস্থাকেই বাস্তবতা মনে করে নিয়েছে। অনেকে নিজেদেরকে পশ্চিমা সভ্যতার অংশ মনে করে, আবার অনেকে নিজেদের ধর্মীয় পরিচয়কে দেখতে শেখে পশ্চিমাদের চোখ দিয়ে। এমনকি যারা পশ্চিমের মোকাবেলার কথা বলে, অনেক সময় তারাও অজান্তে পশ্চিমকে শ্রেষ্ঠ ধরে নিয়ে কথা বলে। কেউ কেউ মনে করে ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে হলে ইসলামকে পশ্চিমা ভাষায় ব্যাখ্যা করতে হবে। তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে দেখাতে যে ইসলাম খুব মানবিক, খুব বিজ্ঞানসম্মত, খুব শান্ত; যেন এসব প্রমাণ করলেই পশ্চিমাদের শত্রুতা বন্ধ হয়ে যাবে। এই মনোভাব মূলত নিজের পরিচয়ের প্রতি হীনমন্যতা ছাড়া আর কিছু নয়।

আরও একদল মনে করে যে মুসলিম উত্থানের পথ শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগতি। অথচ তারা ভুলে যায় যে কোনো সভ্যতা প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ হচ্ছে বিশ্বাস, আদর্শ, নৈতিকতা ও সামরিক শক্তি; তারপর আসে অর্থনীতি ও প্রযুক্তির অগ্রগতি। এই ঐতিহাসিক সত্য ভুলে গিয়ে তারা অন্ধভাবে পশ্চিমের মডেলকে নকল করতে থাকে। "ইসলামী গণতন্ত্র", "ইসলামী ব্যাংকিং", "ইসলামী নারীবাদ" এসব নামের অন্তরালে মূলত পশ্চিমা ধারণার অনুকরণই দেখা যায়। এই অন্ধ অনুকরণ মুসলিম বিশ্বের পরাজিত অবস্থাকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করেছে।

এই সব ভুলের মূল কারণ হলো অনেকেই আগে থেকেই একটি সিদ্ধান্ত বা উপসংহারকে সত্য ধরে নেয়, তারপর সেই উপসংহারের সাথে মিলিয়ে ইসলামকে ব্যাখ্যা করে। গণিতের মতো, আগে উত্তর লিখে পরে হিসাব মেলানোর চেষ্টা করে। পশ্চিমের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার বদলে

তারা বেছে নিয়েছে পশ্চিমকে অনুসরণ করা। অথচ পশ্চিমা সভ্যতা ও ইসলামি আদর্শের মূল দর্শন একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই মৌলিক পার্থক্য বোঝা না গেলে পশ্চিমা প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

অধ্যায় ৪-মুক্তিলাভের উপায়

পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্তিলাভের উপায় জানার আগে আমাদের জানতে হবে কীভাবে তাদের এসব অসুস্থ সংস্কৃতি মুসলিমদের মাঝে প্রবেশ করেছে।পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কিছু বিষয় উঠে এসেছে।আরও কিছু মাধ্যম রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে তাদের জীবনধারা আমাদের মধ্যে চলে এসেছে।সংক্ষিপ্ত আকারে বিষয়গুলো তুলে ধরা হলোঃ

১)শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেঃ

পশ্চিমা সংস্কৃতি মুসলিম সমাজে সবচেয়ে আগে প্রবেশ করে শিক্ষার মাধ্যমে। উপনিবেশিক আমলে পশ্চিমারা মুসলিম দেশগুলোতে নিজেদের শিক্ষা পদ্ধতি চালু করে। তারা ধর্মভিত্তিক শিক্ষার জায়গায় এনে দেয় ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা।ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য দর্শন বাধ্যতামূলক করা হয়।ফলে তরুণ প্রজন্ম আল্লাহভিত্তিক চিন্তার পরিবর্তে মানুষকেন্দ্রিক চিন্তায় অভ্যস্ত হয়।এই প্রভাব আজও বহাল রয়েছে, কারণ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামি নৈতিক শিক্ষা অনেক কম গুরুত্ব পায়।

২)মিডিয়া ও বিনোদনের মাধ্যমেঃ

মিডিয়া পশ্চিমা সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম।টেলিভিশন, সিনেমা, ওয়েব সিরিজ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় পশ্চিমা জীবনধারাকে আধুনিকতা হিসেবে প্রচার করা হয়। ফ্যাশন, রোমান্স, স্বাধীনতা এসব বিষয় মুসলিম তরুণদের মনে আকর্ষণ তৈরি করে।ফলে তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে পুরোনো বলে মনে করতে শুরু করে।এভাবেই মিডিয়া মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

৩)বিশ্বনায়নের মাধ্যমেঃ

বিশ্ব এখন এক "গ্লোবাল ভিলেজ"।ইন্টারনেট, বাণিজ্য ও পর্যটনের কারণে পশ্চিমা প্রভাব এখন সীমাহীনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।পশ্চিমা পোশাক, খাবার, ভাষা ও পণ্যের ব্যবহার মুসলিম দেশগুলোতে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।বিশ্বায়নের মাধ্যমে পশ্চিমা ধারণা উন্নত জীবনযাপন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।ফলে মুসলিম সমাজে ইসলামিক মূল্যবোধের পরিবর্তে পশ্চিমা জীবনধারার অনুকরণ বাড়ছে।

৪)অর্থনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমেঃ

পশ্চিমা দেশগুলো বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণে আছে।তারা মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য, ঋণ ও সাহায্যের সম্পর্ক গড়ে তোলে।এই সম্পর্কের মাধ্যমে তারা নিজেদের অর্থনৈতিক নীতি ও ভাবধারা চাপিয়ে দেয়।পুঁজিবাদ ও সুদের প্রথা মুসলিম অর্থনীতিতে প্রবেশ করে। ফলে ইসলামি অর্থনীতির ন্যায়ভিত্তিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে।মানুষের জীবনে অর্থই হয়ে ওঠে সাফল্যের মাপকাঠি।

৫)রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমেঃ

পশ্চিমা শক্তিগুলো মুসলিম দেশগুলোতে রাজনৈতিকভাবেও প্রভাব বিস্তার করেছে।তারা "গণতন্ত্র", "মানবাধিকার" ও "নারী স্বাধীনতা"র নামে নিজেদের ধারণা ছড়িয়ে দিয়েছে।ইসলামভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে গেছে।পাশ্চাত্য পরামর্শদাতা ও সংস্থা অনেক মুসলিম দেশের নীতিনির্ধারণে অংশ নিচ্ছে।ফলে ইসলামি রাজনীতি ও সামাজিক কাঠামো ধীরে ধীরে পাশ্চাত্যের পথে হাঁটছে।

৬) সংস্কৃতিক অনুকরণঃ

মুসলিম সমাজে পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণ এখন সাধারণ বিষয়।পোশাক, ভাষা, খাবার, বিনোদন ও উৎসবে পশ্চিমা ধারা দৃশ্যমান।অনেকে পশ্চিমা উৎসব যেমন ভ্যালেন্টাইনস ডে, নিউ ইয়ার, হ্যালোইন ইত্যাদি পালন করে।এই অনুকরণ তরুণদের কাছে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধীরে ধীরে ইসলামী রীতিনীতি ও সামাজিক মানদণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ছে।

৭) বিজ্ঞাপন ও বাজারব্যবস্থার মাধ্যমেঃ

বিজ্ঞাপন পশ্চিমা সংস্কৃতির গোপন বাহন।টেলিভিশন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় যে জীবনধারা প্রচার করা হয়, তা ভোগবাদ ও সৌন্দর্য নির্ভর।নারীকে সেখানে পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।ফলে মুসলিম সমাজেও প্রদর্শন, বিলাসিতা ও ফ্যাশন সংস্কৃতি বাড়ছে।এই প্রভাব ইসলামি সংযম ও পর্দা সংস্কৃতিকে দুর্বল করেছে।

৮) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমেঃ

ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব ও টিকটকের মতো প্ল্যাটফর্ম পশ্চিমা প্রভাবের নতুন বাহন।তরুণ প্রজন্ম সেখানে অধিকাংশ সময় ব্যয় করে।তারা পশ্চিমা কনটেন্ট দেখে, তাদের ভাষা, পোশাক ও আচরণ অনুকরণ করে।এই মাধ্যমে ইসলামি নৈতিকতা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে।অনেকেই এখন ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিবর্তে জনপ্রিয়তার দিকে ঝুঁকছে।

৯)পশ্চিমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন ও অভিবাসনের মাধ্যমেঃ

অনেক মুসলিম শিক্ষার্থী পশ্চিমা দেশে পড়াশোনা করতে যায়।সেখানে তারা পশ্চিমা ধারণা ও জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হয়।ধীরে ধীরে তারা সেই সংস্কৃতি গ্রহণ করে ফেলে।দেশে ফিরে তারা সামাজিক, প্রশাসনিক বা শিক্ষাক্ষেত্রে সেই প্রভাব ছড়িয়ে দেয়।এভাবেই পশ্চিমা চিন্তাধারা সরাসরি মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে।

১০)জাতিসংঘ ও এনজিওগুলোর প্রভাবের মাধ্যমেঃ

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো মানবাধিকার, নারী উন্নয়ন ও পরিবার পরিকল্পনার নামে কাজ করে।তাদের অনেক কর্মসূচিতে পশ্চিমা মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত থাকে।যেমনঃ সমলিঙ্গ বিবাহ, লিঙ্গ সমতা ও জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচার।এসব ধারণা মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তবুও উন্নয়ন বা অগ্রগতির নামে অনেক মুসলিম দেশ এসব গ্রহণ করছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো থেকে মুক্তিলাভ করতে হলে আমাদের বেশ কিছু উপায় অবলম্বন করতে হবে।যেহেতু তাদের সাংস্কৃতিক প্রভাব আমাদের সমাজে এক দুইদিনে প্রবেশ করেনি,যুগের পর যুগ ধরে তারা বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা চালিয়ে খুবই সূক্ষ্মভাবে তাদের মতাদর্শগুলো আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে।তাই আমাদেরও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের এসব প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

৪.১ দ্বীন প্রতিষ্ঠা

পশ্চিমা প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদের সর্বপ্রথম ইসলামকে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।এজন্য প্রথমে আমাদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির অধিকারী হতে হবে। যদি আমরা আল্লাহর রাসূলের মাক্কি ও মাদানি জীবনের প্রতি লক্ষ করি, তাহলে এ বাস্তব সত্যটি আমাদের সামনে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মক্কায় মুসলিমদের সামাজিক-রাজনৈতিক কোনো ক্ষমতা ছিল না, যে কারণে আইন প্রয়োগ বা প্রণয়ন কোনোটাই তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেজন্য মাক্কি জীবনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কোনো ধরনের সামাজিক আইনকানুন নাযিল করেননি। সে সময়ে তাদের শুধু ঈমানি তারবিয়াতই দেওয়া হতো এবং ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোই শেখানো হতো। হিজরতের পর মদিনায় মুসলিমদের রাজনৈতিক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণে যখন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজের মানুষের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান দেওয়ার মতো অবস্থা যখন সৃষ্টি হয়, আইনকানুন প্রয়োগ ও প্রণয়নের ক্ষমতা তাদের হাতে আসে, তখনই আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের ওপর 'হুদুদ', 'কিসাস'সহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আইনকানুন নাযিল করেন।

সাইয়িদ কুতুব শহিদ উনার লিখিত 'মাইলস্টোন" বইয়ে এই বিষয়ে কিছু দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।তিনি বলেছেন, "ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রথম যুগের মতো করেই শুরু করতে হবে। ইসলাম যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে একমাত্র সেই পদ্ধতিতেই হবে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এমন একটি মানবগোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে, যাদের মন-মগজে ঈমানের নির্ভেজাল চেতনা গভীরভাবে বদ্ধমূল হবে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও আনুগত্য বা গোলামি না করার ব্যাপারে তারা হবে পাহাড়সম অটল। এ আকিদা-বিশ্বাসের আলোকে গড়ে ওঠা কোনো মানবগোষ্ঠী যখন সমাজের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে, তখনই সে সমাজের চাহিদা অনুসারে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী আইনকানুন রচনা সম্ভব হবে। ইসলামি জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য এটি হলো আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত একমাত্র পদ্ধতি। আর তার নির্ধারিত পন্থা অগ্রাহ্য করে মানবমস্তিষ্কপ্রসূত, আপাতদৃষ্টিতে যৌক্তিক কোনো পন্থা অবলম্বন করা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। গ্রহণ করা হলেও সেসব পদ্ধতিতে পরিচালিত আন্দোলন হয়তো এক পা-দুই পা এগোবে, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে"।

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে যারা জিহাদ করেন, তাদের ইসলামি বিপ্লবের আলোচিত এ পদ্ধতিটি কোনোক্রমে ভুলে গেলে চলবে না। এটা বুঝতে কারোরই অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, মাক্কি জীবনে অবতীর্ণ কুরআন উল্লিখিত পদ্ধতিতে একই সাথে মানুষের ঈমান মজবুত করেছে এবং রাজনৈতিকভাবে সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠার দুর্বার আন্দোলনকে সফল করে তোলার মতো একদল সুসংগঠিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানবদল তৈরি করেছে। আগে ঘরে বসে লেখাপড়া করে দ্বীন বুঝে আন্দোলনে যোগদান নয়; বরং একই সাথে আন্দোলন ও শিক্ষার সমন্বয়ে এ সংগ্রামী মানবদলটির জন্ম হয়। এটি হলো সরাসরি আল্লাহর নির্দেশনায় প্রস্তুতকৃত ইসলামি আন্দোলনের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণীয় একমাত্র মডেল। নিকট কিংবা দূর-ভবিষ্যতে যখনই কোনো দল ইসলামি জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করবে, তখন তাদের এ পদ্ধতিটি অনুসরণ করতে হবে।

৪.২ পারিবারিক বন্ধন দৃঢ়করণ

পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে আজকের মুসলিম সমাজে পারিবারিক বন্ধন দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা, আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা ও আধুনিক ব্যস্ততার কারণে মানুষ পরিবার থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। আগে যেখানে পরিবার ছিল পারস্পরিক ভালোবাসা, সহানুভূতি ও

সহযোগিতার কেন্দ্র, এখন সেখানে গড়ে উঠছে এক ধরনের মানসিক দূরত্ব। তাই সমাজে নৈতিকতা ও ঐক্য ফিরিয়ে আনতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করা।
ইসলাম পরিবারকে সমাজের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে। পরিবারের মধ্য দিয়েই একজন মানুষ নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও সামাজিক আচরণের শিক্ষা পায়। কুরআনে বলা হয়েছে,

وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

"পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর" (সূরা আন-নিসা, ৪:৩৬)।
এই নির্দেশ প্রমাণ করে যে পারিবারিক সম্পর্ক শুধু রক্তের বন্ধনের জন্য নয়, বরং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব, সম্মান ও সহমর্মিতা রক্ষার জন্য অপরিহার্য।একটি দৃঢ় পারিবারিক বন্ধন গড়ে উঠতে হলে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, সময় দেওয়া এবং সমস্যায় একে অপরের পাশে দাঁড়ানো জরুরি। পরিবারে যদি পারস্পরিক আলোচনা, পরামর্শ ও বোঝাপড়া থাকে, তবে মানসিক সম্পর্কও মজবুত হয়। সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা ও যত্ন প্রদর্শন করা এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা ইসলামী দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
একই সঙ্গে পরিবারে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চা করা জরুরি। সন্তানরা যখন তাদের পিতা-মাতা ও বড়দের আচরণে ইসলামি নীতি দেখতে পায়, তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই সেই পথে অনুপ্রাণিত হয়। পারিবারিক পরিসরে একে অপরের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতা সমাজে ঐক্য সৃষ্টি করে।পশ্চিমা সমাজে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হওয়ার অন্যতম কারণ হলো আত্মকেন্দ্রিক জীবনধারা এবং ভোগবাদী চিন্তা। সেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতাই মুখ্য, যার ফলে পরিবারে সম্মিলিত দায়িত্ব ও ভালোবাসা হারিয়ে যাচ্ছে। ইসলাম এই প্রবণতার বিপরীতে পারিবারিক সংহতি, পারস্পরিক সম্মান ও দায়িত্ববোধের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে।
ইসলামী শিক্ষার আলোকে, পরিবার হলো সমাজের প্রথম বিদ্যালয়। এখানে সন্তানরা শেখে সততা, ধৈর্য, ভালোবাসা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মতো গুণাবলি। পরিবার যখন শক্তিশালী হয়, তখন সমাজও দৃঢ় হয়, নৈতিকতা টিকে থাকে, এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে।
অতএব, পশ্চিমা প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে হলে মুসলিম সমাজকে পরিবারের বন্ধনকে পুনর্গঠন করতে হবে। পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, ভালোবাসা, ধর্মীয় অনুশাসন এবং সম্মিলিত দায়িত্ববোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। একটি দৃঢ় পরিবারই গড়ে তুলতে পারে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিকভাবে শক্তিশালী প্রজন্ম, যারা ইসলামি মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের প্রকৃত মুক্তি ও স্থিতিশীলতা আনতে সক্ষম হবে।

৪.৪ আত্মপরিচয়ের জাগরণ

পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্যতম বড় প্রভাব হলো মানুষকে নিজের পরিচয় ও মূল্যবোধ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা। মুসলিম সমাজের বহু মানুষ আজ নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় ভিত্তি থেকে দূরে সরে গিয়ে পশ্চিমা জীবনধারাকে অনুসরণ করছে। এই মানসিক পরিবর্তন ধীরে ধীরে আমাদের আত্মপরিচয়কে দুর্বল করে দিয়েছে। তাই মুক্তিলাভের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো আত্মপরিচয়ের জাগরণ, অর্থাৎ আমরা কারা, আমাদের বিশ্বাস কী, এবং আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিত্তি কোথায় এই বোধকে পুনরুজ্জীবিত করা।।পশ্চিমা সংস্কৃতি ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ভোগবাদকে এমনভাবে প্রচার করেছে যে মানুষ এখন নিজের পরিচয়কে বস্তুগত অর্জনের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে চায়। কিন্তু ইসলাম শেখায়, প্রকৃত মর্যাদা আল্লাহর কাছে তাকওয়া ও নৈতিকতার মাধ্যমে অর্জিত হয়। কুরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন, যে সবচেয়ে পরহেজগার।" (সূরা আল-হুজরাত, ৪৯:১৩)।

আত্মপরিচয়ের জাগরণ মানে কেবল ধর্মীয় দিক জানা নয় বরং নিজের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়াও জরুরি। মুসলিম সভ্যতা একসময় জ্ঞান, বিজ্ঞান, নৈতিকতা ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমা প্রভাবের কারণে সেই গৌরব ভুলে গিয়ে আমরা অন্যদের অনুকরণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি।এই অন্ধ অনুকরণ আমাদের মধ্যে **"Cultural Inferiority Complex"** সৃষ্টি করেছে [৪২] অর্থাৎ আমরা নিজের সংস্কৃতিকে তুচ্ছ মনে করতে শিখেছি, আর পশ্চিমা সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে শুরু করেছি।

এই মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে হলে আত্মপরিচয়ের জাগরণ অপরিহার্য। ইসলাম আমাদের আত্মমর্যাদা ও দায়িত্বের কথা স্মরণ করায়। আত্মপরিচয়ের জাগরণ সমাজে আত্মবিশ্বাস, নৈতিক দৃঢ়তা ও একতা সৃষ্টি করে। যখন ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম হিসেবে গর্বিতভাবে চেনে, তখন সে সহজে ভোগবাদ, অশ্লীলতা বা পশ্চিমা প্রলোভনে প্রভাবিত হয় না। বরং সে ইসলামি মূল্যবোধের আলোকে জীবন গঠনে আগ্রহী হয়।

---

[৪২] Esposito, J. L. (2003). Islam and Moral Revival. Oxford University Press

শিক্ষা ও পরিবার এই জাগরণের দুটি প্রধান ভিত্তি। পরিবারে ধর্মীয় শিক্ষা, ইসলামী ইতিহাস ও নৈতিক গল্প শোনানো শিশুর আত্মপরিচয়কে শক্তিশালী করে। আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও ইসলামি চিন্তা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান প্রদান করা প্রয়োজন। এতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ইতিহাস ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাস অর্জন করে।

পশ্চিমা প্রভাবের মোকাবেলায় মুসলিম সমাজকে জানতে হবে আমরা কেবল ইতিহাসের অনুসারী নই, আমরা এক মহৎ সভ্যতার ধারক ও বাহক। ইসলাম যে ন্যায়, জ্ঞান, মানবিকতা ও সংযমের শিক্ষা দেয়, সেটিই আমাদের প্রকৃত পরিচয়। এই আত্মপরিচয় জাগ্রত হলে মানুষ নিজের বিশ্বাসে দৃঢ় হয় এবং অন্য সংস্কৃতির অনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে।মুক্তিলাভের পথ শুরু হয় আত্মপরিচয়ের জাগরণ থেকে। মানুষ যখন নিজের পরিচয়, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়, তখনই সে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হয় চিন্তায়, আচরণে ও জীবনে। ইসলাম এই আত্মজ্ঞানকেই প্রকৃত মুক্তি বলে, যা কেবল বাহ্যিক উন্নয়ন নয়, বরং আত্মিক শক্তি ও নৈতিক দৃঢ়তার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

৪.৫ ইসলামী জাতীয়তাবাদ

পশ্চিমারা মুসলিমদের মাঝে যে জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেছে তা মুসলিম উম্মাহকে খন্ড বিখন্ড করে দিয়েছে।প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে খিলাফাহর পতনের মাধ্যমেই মুসলিম জাতির ঐক্য ভেঙ্গে গেছে।এখন মুসলিম উম্মাহর অবস্থা হয়েছে ছন্নছাড়া ভিখারীর মত যারা পশ্চিমাদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে তাদের আদর্শকে।আমরা আজ মুসলিমরাই মুসলিমদের শত্রু মনে করি আর কাফিরদের মনে করি বন্ধু যেখানে কুরআনে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট কাফিরদেরকে আমাদের শত্রু ঘোষণা করেছেন।কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

"হে মুমিনগণ! ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই একে অন্যের বন্ধু! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে হিদায়াত দান করেন না"।(সূরা আল-মায়িদা,৫:৫১)

ইসলাম পৃথিবীতে নিছক অন্তরে লালিত অনুভূতি হয়ে থাকতে আসেনি; বরং আকিদা-বিশ্বাসসহ মানুষের গোটা জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, পারস্পরিক সম্পর্ক সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে এসেছে। তাই ইসলাম আসার সাথে সাথেই তার অনুসারীদের জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা কার সাথে সম্পর্ক

গড়বে, কার সথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে, কাকে ভালোবাসবে, কাকে ঘৃণা করবে, কী গ্রহণ করবে, স্ত্রী বর্জন করবে। এক্ষেত্রে যে মূলনীতি ইসলাম স্থাপন করেছে, তা হলো-

'আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করা'।

'আল্লাহর জন্য গ্রহণ করা, আল্লাহর জন্যই বর্জন করা'।

অর্থাৎ, গ্রহণ-বর্জন, ঘৃণা-ভালোবাসার নীতি ও মানদণ্ড নির্ধারণ করবেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। কেননা, এই বিশ্বজগতের সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি। আমরা সবাই আল্লাহর ইচ্ছাতেই জন্মগ্রহণ করেছি। সম্পর্ক স্থাপনের ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন গড়ে তোলার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা যে মূলনীতি ঘোষণা করেছেন, তা দুনিয়ার কোনো তুচ্ছ অর্থবিত্ত-রক্ত-বংশ-গোত্র-জাতীয়তা নয়; বরং তা হলো ঈমান। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এই একটি বন্ধনই মানুষকে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ করতে পারে, হৃদয়ে হৃদয়ে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। অন্য সকল সম্পর্কই ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক। পরিবেশ-পরিস্থিতি ও কালের আবর্তনে অন্য সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, কিন্তু ঈমানের সম্পর্ক কোনোদিনই ছিন্ন হয় না।

৪.৬ শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার

একটি জাতির উন্নয়ন ও নৈতিকতার মূলভিত্তি হলো তার শিক্ষা ব্যবস্থা। সমাজের চিন্তা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ গঠনের প্রধান উৎসও শিক্ষা। কিন্তু পশ্চিমা প্রভাবের কারণে মুসলিম সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে তার মৌলিক লক্ষ্য ও আত্মিক দিক হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমান শিক্ষা অনেকাংশে জীবিকা অর্জনের উপকরণে পরিণত হয়েছে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের মাধ্যম নয়। তাই মুক্তিলাভের অন্যতম উপায় হলো শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার।

পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা মুসলিম সমাজে সেক্যুলার ও ভোগবাদী চিন্তা ছড়িয়ে দিয়েছ।। সেখানে সফলতার মানদণ্ড হলো কেবল পেশাগত উন্নতি ও আর্থিক সমৃদ্ধি। ফলে শিক্ষার্থীরা আত্মিক ও নৈতিক দিক থেকে শূন্য হয়ে পড়ছে। তারা নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে।ইসলামী দৃষ্টিতে শিক্ষা কেবল জ্ঞান অর্জন নয়, বরং চরিত্র গঠন ও আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া। কুরআনে বলা হয়েছে,

رَبِّ هَبۡ لِیۡ حُکۡمًا وَّاَلۡحِقۡنِیۡ بِالصّٰلِحِیۡنَ

“হে আমার প্রভু, আমাকে জ্ঞান দাও এবং সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করো।” (সূরা আশ-শু’আরা, ২৬:৮৩)

এই দোয়াটি শেখায় যে, জ্ঞান ও নৈতিকতা পরস্পর সম্পর্কিত। যে শিক্ষা মানুষকে ন্যায়, সততা ও আল্লাহভীতির পথে পরিচালিত করে না, তা অসম্পূর্ণ শিক্ষা।

বর্তমান মুসলিম সমাজে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামি মূল্যবোধের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ধর্মীয় জ্ঞান প্রায়ই উপেক্ষিত। শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ব্যবসায়িক জ্ঞান অর্জন করছে, কিন্তু তাদের মধ্যে মানবিকতা, দায়িত্ববোধ ও নৈতিক শক্তি গড়ে উঠছে না। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে এমন এক প্রজন্ম গড়ে উঠছে, যারা আধুনিক জ্ঞান রাখে, কিন্তু আত্মপরিচয় সম্পর্কে বিভ্রান্ত।

শিক্ষা সংস্কারের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ধর্মীয় ও আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয়। ইসলাম কখনও আধুনিক বিজ্ঞান বা যুক্তিকে অস্বীকার করেনি; বরং ইসলাম জ্ঞানের প্রতিটি শাখাকে আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে। নবী করিম (স.) বলেছেন,

"জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ।"[৪৩]

এই হাদিসের মাধ্যমে বোঝা যায়, জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য কেবল কর্মসংস্থান নয়, বরং আল্লাহর সৃষ্টি ও বিধানকে বুঝে নৈতিক জীবন গঠন করা।শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার মানে হলো শিক্ষাকে পুনরায় নৈতিকতা, মানবিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে স্থাপন করা। এজন্য পাঠ্যক্রমে ইসলামি ইতিহাস, নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও আত্মশুদ্ধির পাঠ যুক্ত করা জরুরি। পাশাপাশি শিক্ষকগণকেও হতে হবে নৈতিকভাবে দৃঢ় ও আদর্শবান, যাতে তারা শিক্ষার্থীদের কাছে কেবল জ্ঞানের উৎস নয়, নৈতিক দিকনির্দেশক হিসেবেও বিবেচিত হন।বর্তমান প্রজন্মের অনেক শিক্ষার্থী পশ্চিমা চিন্তা ও জীবনধারাকে অনুসরণ করছে, কারণ তারা নিজেদের ইতিহাস ও সভ্যতা সম্পর্কে অবগত নয়। এজন্য ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আধুনিকীকরণ এবং আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামি মূল্যবোধ সংযোজন,এই দুই দিক থেকেই পরিবর্তন আনা জরুরি।একটি নৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠলে সমাজে সচেতন, দায়িত্বশীল এবং আত্মিকভাবে শক্তিশালী প্রজন্ম সৃষ্টি হবে। এই প্রজন্মই সমাজে ন্যায়, সাম্য, সততা ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করবে। ইসলাম এমনই এক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলে, যা জ্ঞান ও নৈতিকতাকে একত্রিত করে মানুষের পূর্ণ বিকাশ ঘটায়। সুতরাং, মুক্তিলাভের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার অপরিহার্য। কেবল আধুনিক প্রযুক্তি বা অর্থনৈতিক দক্ষতা অর্জন নয়, বরং শিক্ষাকে এমনভাবে গঠন করতে হবে, যাতে তা মানুষকে

[৪৩]ইবনে মাজাহ, হাদিস ২২৪

আল্লাহভীরু, নৈতিক, দায়িত্ববান এবং আত্মপরিচয়ে দৃঢ় হতে সাহায্য করে। প্রকৃত শিক্ষা সেই, যা মানুষকে মানুষ বানায়,এই সত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই হবে মুসলিম সমাজের মুক্তির অন্যতম পথ।

৪.৭ গণমাধ্যমে নৈতিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা

বর্তমান যুগে গণমাধ্যম সমাজের চিন্তা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ গঠনে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে। টেলিভিশন, সিনেমা, ইন্টারনেট, সামাজিক মাধ্যম এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষ প্রতিদিন নতুন ধারণা ও প্রবণতার মুখোমুখি হয়। পশ্চিমা প্রভাবের কারণে এই গণমাধ্যমগুলো এখন অনেক ক্ষেত্রেই বিনোদনের নামে অশ্লীলতা, ভোগবাদ এবং নৈতিক অবক্ষয়কে প্রচার করছে। ফলে মুসলিম সমাজের তরুণ প্রজন্ম ধীরে ধীরে ইসলামি আদর্শ ও নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত হচ্ছে।পশ্চিমা গণমাধ্যমের মূল উদ্দেশ্য এখন কেবল দর্শক আকর্ষণ ও মুনাফা অর্জন, নৈতিক শিক্ষা ন।। এই কারণে সংবাদ, নাটক, চলচ্চিত্র, এমনকি কার্টুনেও অজান্তেই এমন বার্তা দেওয়া হয়, যা ইসলামি মূল্যবোধের পরিপন্থী। এর ফলে মানুষের চিন্তা ও জীবনদর্শনে পরিবর্তন আসে, এবং তারা অনুকরণ করতে শুরু করে সেই পশ্চিমা জীবনধারা, যা ইসলামি নৈতিকতার সাথে সাংঘর্ষিক।ইসলামের দৃষ্টিতে গণমাধ্যম (বা যোগাযোগের মাধ্যম) হলো সমাজে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণ প্রচারের উপকরণ। কুরআনে বলা হয়েছে,

اُدۡعُ اِلٰی سَبِیۡلِ رَبِّکَ بِالۡحِکۡمَۃِ وَالۡمَوۡعِظَۃِ الۡحَسَنَۃِ

“আর উত্তম কথা ও উত্তম কাজের দিকে মানুষকে আহ্বান করো।” (সূরা আন-নাহল, ১৬:১২৫) অর্থাৎ, গণমাধ্যমের প্রকৃত কাজ হলো মানুষকে জ্ঞান, ন্যায় ও নৈতিকতার পথে পরিচালিত করা, বিভ্রান্ত করা নয়।পশ্চিমা সংস্কৃতি গণমাধ্যমকে এমন এক হাতিয়ারে পরিণত করেছে, যা মানুষের মনোযোগকে সত্য ও নৈতিকতা থেকে সরিয়ে ভোগবাদ, অশ্লীলতা ও স্বার্থপরতার দিকে নিয়ে যায়। সিনেমা ও সামাজিক মাধ্যমে প্রেম, বিলাসিতা, ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে ইসলামি সমাজের তরুণরা বাস্তব জীবনের চেয়ে কল্পনার জগতে বেশি ডুবে যাচ্ছে, যার ফলাফল হলো নৈতিক দুর্বলতা ও পারিবারিক মূল্যবোধের পতন।গণমাধ্যমে নৈতিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা মানে হলো মিডিয়াকে আবার সত্য, সৌন্দর্য ও মানবিকতার প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ফিরিয়ে আনা। এজন্য প্রয়োজন ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সংবাদ, বিনোদন ও বিজ্ঞাপন নির্মাণের নতুন ধারা তৈরি করা। ইসলামি মূল্যবোধভিত্তিক নাটক,

চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র ও শিশুতোষ অনুষ্ঠান তৈরি করে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলা সম্ভব।একই সঙ্গে গণমাধ্যমে কর্মরত ব্যক্তিদের নৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি। সাংবাদিক, পরিচালক, লেখক ও শিল্পীদের বুঝতে হবে তাদের কাজ কেবল পেশাগত নয়, সামাজিক দায়িত্বও।তরুণ প্রজন্মের জন্য নৈতিক শিক্ষা ও গণমাধ্যম সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উভয়কেই এ বিষয়ে দায়িত্ব নিতে হবে। তরুণদের শেখাতে হবে,গণমাধ্যমে যা দেখা যায় তা সবসময় সত্য নয়; এর পেছনে রয়েছে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব। এই বোধ জাগ্রত হলে তারা নিজস্ব মূল্যবোধে স্থির থাকবে এবং অন্ধ অনুকরণ থেকে বিরত থাকবে।

পশ্চিমা মিডিয়া মুসলিম সমাজে একটি "Cultural Dependency" তৈরি করেছে, অর্থাৎ আমরা নিজেদের গল্প ও মূল্যবোধের চেয়ে বিদেশি ধারণার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি[৮৮]। এই নির্ভরতা দূর করতে হলে ইসলামি আদর্শে গঠিত নিজস্ব মিডিয়া কাঠামো তৈরি করা জরুরি, যা সত্য, ন্যায়, সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিকতার বার্তা প্রচার করবে।

অতএব, মুক্তিলাভের অন্যতম পথ হলো গণমাধ্যমে নৈতিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। মিডিয়াকে হতে হবে নৈতিকতা ও সত্যের বার্তাবাহক, মানুষকে ভোগবাদী নয় বরং মানবিক ও আত্মিক জীবনের দিকে আহ্বানকারী। ইসলাম এমন এক যোগাযোগব্যবস্থার কথা বলে, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। যদি সমাজে এমন নৈতিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে পশ্চিমা সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব অনেকাংশে প্রতিহত করা সম্ভব হবে।

৪.৮ সমাজ ও নেতৃত্বের ভূমিকা

কোনো জাতির উন্নয়ন বা পতন শুধু ব্যক্তির হাতে নয়, বরং সমাজ ও নেতৃত্বের সম্মিলিত ভূমিকার ওপর নির্ভর করে। সমাজ হলো মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন; আর নেতৃত্ব হলো সেই সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করার শক্তি। তাই পশ্চিমা সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে হলে সমাজ ও নেতৃত্ব উভয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আজকের মুসলিম সমাজে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমা জীবনধারা, পোশাক, বিনোদন, শিক্ষা ও রাজনীতি,সব ক্ষেত্রেই অনুকরণের প্রবণতা বেড়েছে। সমাজে নৈতিকতা, সততা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। নেতৃত্বের অনেক ক্ষেত্রেও ইসলামি নীতিমালা উপেক্ষা করা হচ্ছে। ফলে সমাজে বিভাজন, দুর্নীতি ও আত্মকেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছ।

[88]Wolf, N. (1990). The Beauty Myth. HarperCollins

ইসলাম সমাজ ও নেতৃত্বের সম্পর্ককে একটি আমানত বা দায়িত্ব হিসেবে দেখেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"তোমাদের প্রত্যেকেই একজন নেতা, এবং প্রত্যেকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৪৫]

অর্থাৎ সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি,হোক সে অভিভাবক, শিক্ষক, প্রশাসক বা রাষ্ট্রনেতা,নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ন্যায়, শান্তি ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে।পশ্চিমা নেতৃত্বব্যবস্থা মূলত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বার্থসিদ্ধির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এর ফলে নেতৃত্বে আত্মত্যাগ ও নৈতিকতার চেয়ে জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতালিপ্সাই প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যদিকে, ইসলামি নেতৃত্বের লক্ষ্য হলো ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

"আর আমি তাদের এমন নেতা করেছি, যারা আমার আদেশে মানুষকে সৎ পথে পরিচালনা করত।" (সূরা আস-সাজদাহ, ৩২:২৪)

সমাজ যদি সৎ ও সচেতন হয়, তবে নেতৃত্বও সঠিক পথে চলে। কিন্তু সমাজ যখন ভোগবাদে নিমজ্জিত হয়, তখন নেতৃত্বও দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই ইসলাম সমাজকে কেবল আইন বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ওপর নির্ভর না করে, বরং মানুষে মানুষে নৈতিক বন্ধন ও দায়বদ্ধতার মাধ্যমে গড়ে তুলতে উৎসাহ দেয়।পশ্চিমা সংস্কৃতি মুসলিম সমাজে নেতৃত্বের ধারণাকে পরিবর্তন করেছে। আগে নেতৃত্ব মানে ছিল সেবা ও ত্যাগ, এখন তা অনেক সময় ক্ষমতা ও আধিপত্যের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। এই মানসিক পরিবর্তনের ফলে সমাজে নেতৃত্ব ও জনগণের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক দুর্বল হচ্ছে। ফলে মানুষ হতাশ হচ্ছে এবং পশ্চিমা প্রভাব আরও গভীর হচ্ছে।ইসলামি নেতৃত্ব এমন এক মডেল দেয়, যেখানে নেতা জনগণের সেবক। খলিফা উমর (রা.) রাতে ছদ্মবেশে বের হয়ে মানুষের খবর নিতেন এমন উদাহরণ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, নেতৃত্ব মানে শাসন নয়, দায়িত্ব। ইসলাম বলে, ন্যায়পরায়ণ নেতা আল্লাহর ছায়াতলে থাকবেন, যেদিন অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।

সমাজের প্রতিটি স্তরে পরিবার, শিক্ষা, অর্থনীতি, গণমাধ্যম, রাজনীতি নৈতিক নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। নৈতিক নেতৃত্বই সমাজে সচেতনতা, ঐক্য ও আত্মসম্মান সৃষ্টি করতে পারে। পরিবারে অভিভাবক, স্কুলে শিক্ষক, রাষ্ট্রে প্রশাসক সবার ভূমিকা একে অপরের পরিপূরক।অন্যদিকে, জনগণকেও নেতৃত্বের প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে। ইসলাম বলে, অন্যায় দেখলে তা প্রতিরোধ

[৪৫]সহিহ বুখারি, হাদিস ৮৯৩

করতে হবে, না হলে পুরো সমাজই ক্ষতির মুখে পড়ে।অতএব, সমাজের সংস্কার ও মুক্তিলাভের জন্য প্রথমে দরকার ইসলামি নৈতিকতার ভিত্তিতে সমাজ ও নেতৃত্বের পুনর্গঠন। যখন সমাজ ন্যায়, সহযোগিতা ও দায়িত্ববোধে গড়ে উঠবে, তখন নেতৃত্বও হবে নৈতিক ও জনগণের কল্যাণে নিবেদিত। পশ্চিমা প্রভাব তখন আর সমাজকে প্রভাবিত করতে পারবে না, কারণ ইসলামী মূল্যবোধই হবে সমাজের কেন্দ্রবিন্দু।মুসলিম সমাজে নৈতিক নেতৃত্ব গড়ে উঠলে পশ্চিমা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক ধরনের "মৌলিক প্রতিরোধশক্তি" তৈরি হয়। অর্থাৎ, সমাজ তখন নিজের আদর্শে দৃঢ় থাকে, অন্য সংস্কৃতির দ্বারা সহজে প্রভাবিত হয় না।

৪.৯ মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্তি

পশ্চিমা আগ্রাসনের সবচেয়ে গভীর ক্ষতি হলো মুসলিমদের উপর সৃষ্ট মানসিক দাসত্ব। উপনিবেশিক শক্তিগুলো আমাদের সম্পদ লুট করেছে, রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙেছে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা বদলে দিয়েছে কিন্তু এসব ক্ষতি সময়ের সাথে পূরণ করা যায়। সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতি তারা করেছে মানুষের চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আত্মপরিচয়ের ওপর। তারা জানত, কোনো জাতিকে চিরদিন নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তার মনকে দখল করতে হবে। তাই পশ্চিমারা মুসলিম সমাজে নিজেদের শিক্ষা পদ্ধতি, ভাষা, মূল্যবোধ ও জীবনদর্শন ঢুকিয়ে দেয়। স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার পরও আমরা সেই মানসিক শেকল পুরোপুরি ছিঁড়তে পারিনি। আজও অনেক মুসলমান পশ্চিমা ধারণাকেই "উন্নত", "সভ্য" এবং "আধুনিক" মনে করে; আর নিজেদের ধর্মীয় মূল্যবোধকে কম গুরুত্ব দেয়। ফলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ হয়ে গেছে।আমরা পৃথিবীকে পাশ্চাত্যের চোখে দেখতে শিখেছি।

এই মানসিক দাসত্ব মুসলিম সমাজকে দুর্বল করেছে। আমরা মনে করি পশ্চিমা শক্তি অপরাজেয়, তাদের সভ্যতা চিরস্থায়ী। কিন্তু ইতিহাস বলে পৃথিবীতে কোনো সাম্রাজ্য স্থায়ী নয়। শক্তিশালী ফিরআউন ও তার রাজত্ব ধ্বংস হয়ে গেছে। আদ ও সামূদের অতিকায় সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আলেকজান্ডারের বিরাট সাম্রাজ্য তার মৃত্যুর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ভেঙে যায়। মঙ্গোলরা একসময় অপ্রতিরোধ্য ছিল, কিন্তু পরে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছে। শক্তিশালী নাৎসি বাহিনীও ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গেছে। কিন্তু ইসলাম আজও টিকে আছে এবং পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করছে। এর কারণ ইসলাম তাওহিদের শিক্ষা বহন করে, যা সময়, যুগ ও সভ্যতার ঊর্ধ্বে[৪৬]।

এই ঐতিহাসিক সত্য বুঝতে পারলেই মানসিক দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব। মুসলমানদের প্রথম কাজ হলো নিজেদের মধ্যে থাকা অদৃশ্য শেকলগুলোকে চিনতে শেখা যেসব শেকল আমাদের পরাধীন ভাবে ভাবতে বাধ্য করে। বুঝতে হবে, পশ্চিমা সভ্যতা অগ্রসর হলেও তা চিরন্তন নয়। আর মুসলমানের প্রকৃত শক্তি কোনো ভৌত সাম্রাজ্যে নয়, আল্লাহর উপর নির্ভরতার মধ্যে। আল্লাহ চিরন্তন, অপরাজেয় আর বাকি সব সভ্যতা একদিন ধ্বংস হবে। তাই মুসলমান হিসেবে আমাদের করণীয় হলো আল্লাহর আনুগত্য করা, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে জীবনের কেন্দ্র করা, এবং নিজের পরিচয়ের মর্যাদা ফিরে পাওয়া। এই আত্মপরিচয় শক্তিশালী হলে পশ্চিমা মানসিক আগ্রাসন আমাদের ওপর আর প্রভাব ফেলতে পারবে না।

৪.১০ দু'আ ও আত্মশুদ্ধি

পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্তি শুধু সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্ভব নয়; এর মূল শুরু হয় ব্যক্তির অন্তর থেকে। মানুষ যদি নিজেকে শুদ্ধ করতে পারে, তবে সমাজও শুদ্ধ হয়। ইসলাম এই ব্যক্তিগত পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দু'আ (প্রার্থনা) ও আত্মশুদ্ধির (তাযকিয়াহ) ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে।দু'আ হলো মুমিনের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"দু'আ ইবাদতের মূল।"[৪৭]

অর্থাৎ, আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষ তার অন্তরের পবিত্রতা ও শক্তি ফিরে পায়। এই দু'আ শুধু কোনো প্রয়োজনের জন্য নয়, বরং আত্মিক শান্তি ও নৈতিক দৃঢ়তার জন্যও প্রয়োজন।আজকের যুগে মুসলিম সমাজ যে নৈতিক সংকটে ভুগছে, তার মূল কারণ হলো আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যাওয়া। পশ্চিমা জীবনধারা মানুষকে বাহ্যিক সাফল্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে, কিন্তু আত্মার শান্তি কেড়ে নিয়েছে। ফলে মানুষ উদ্বেগ, হতাশা ও অস্থিরতায় ভুগছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

"জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর শান্তি পায়।" (সূরা আর-রা'দ, ১৩:২৮)

---

[৪৬]ড. আসাদ যামানের 'European Transition To Secular Thought', এবং 'The Conquest Of Knowledge' অবলম্বনে।

[৪৭]সুনান আত-তিরমিজি, হাদিস ৩৩৭১

আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়াহ হলো নিজের ভেতরের অপবিত্র চিন্তা, লোভ, অহংকার ও অন্যায় প্রবণতাকে দূর করা। ইসলাম বলে, প্রকৃত মুক্তি তখনই আসে যখন মানুষ নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। কুরআনে বলা হয়েছে,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا

"যে নিজেকে শুদ্ধ করেছে, সে-ই সফল।" (সূরা আশ-শামস, ৯১:৯)

আত্মশুদ্ধি মানে কেবল নামাজ, রোজা বা হজ পালন নয়; বরং চরিত্র, আচরণ, কথাবার্তা ও চিন্তায় আল্লাহভীতি প্রতিষ্ঠা করা। একজন সত্যিকারের মুসলিম প্রতিদিন নিজের কাজ পর্যালোচনা করে, আমি কি কারও প্রতি অন্যায় করেছি? আমি কি আল্লাহর আদেশ মেনে চলেছি? এই আত্মসমালোচনাই আত্মশুদ্ধির প্রথম ধাপ।

পশ্চিমা সংস্কৃতি মানুষকে বাহ্যিক সাজসজ্জা ও বস্তুগত উন্নতির দিকে মনোযোগী করেছে। ফলে আত্মিক উন্নয়ন বা নৈতিক পরিশুদ্ধির জায়গাটি ফাঁকা হয়ে গেছে। এই ফাঁক পূরণ করতে হবে ইসলামি আত্মশুদ্ধির শিক্ষার মাধ্যমে যেমন নামাজে মনোযোগ, কুরআন তিলাওয়াত, যিকর, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও দানশীলতা।আত্মশুদ্ধি শুধু ব্যক্তিগত নয়; এটি সামাজিক পরিবর্তনেরও ভিত্তি। যখন সমাজের মানুষ আল্লাহভীরু হয়, তখন তারা অন্যায়, দুর্নীতি বা অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকে। ইতিহাসে দেখা যায়, নবী (সা.) মক্কার সমাজ পরিবর্তন করেছিলেন মানুষের অন্তরের সংস্কারের মাধ্যমে। প্রথমে তিনি মানুষের হৃদয়ে ঈমান, তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধির বীজ বপন করেছিলেন, তারপর সমাজে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

দু'আ ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মানুষ তার জীবনে ভারসাম্য ফিরে পায়। পশ্চিমা সংস্কৃতি যেখানে মানুষকে স্বার্থপরতা ও প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেয়, ইসলাম সেখানে মানুষকে বিনয়, সহযোগিতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায়। আত্মশুদ্ধি একজন মানুষকে শুধু ভালো মুসলিমই বানায় না, বরং তাকে সমাজের জন্য কল্যাণকর ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। এই উক্তি আমাদের মনে করিয়ে দেয় আত্মশুদ্ধি মানে শুধু পাপ থেকে দূরে থাকা নয়, বরং নিজের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য বোঝা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

দু'আ মানুষকে আল্লাহর ওপর নির্ভর করতে শেখায়, যা তাকে পশ্চিমা ভোগবাদী চিন্তা থেকে দূরে রাখে। যিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর ভরসা রাখেন, তিনি কখনও বস্তুবাদী সমাজের দাস হতে পারেন না। তাই মুক্তিলাভের শেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো আন্তরিক দু'আ ও আত্মশুদ্ধি যা অন্তরকে জাগ্রত করে, নৈতিকতাকে দৃঢ় করে, এবং সমাজে আধ্যাত্মিক আলোর

সৃষ্টি করে।"Self-purification creates moral immunity against cultural aggression" অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি এমন এক মানসিক প্রতিরোধশক্তি তৈরি করে, যা পশ্চিমা সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাবকে প্রতিহত করে[৪৮]।

অতএব, মুসলিম সমাজ যদি সত্যিকার অর্থে পশ্চিমা প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চায়, তবে শুরুটা হতে হবে প্রতিটি ব্যক্তির অন্তর থেকে দু'আ, যিকর, আত্মসমালোচনা ও নৈতিক চর্চার মাধ্যমে। যখন অন্তর শুদ্ধ হবে, তখন সমাজও শুদ্ধ হবে, এবং ইসলামি সভ্যতার মূল চেতনা আবার জীবিত হবে।

[৪৮]সাইয়্যিদ কুতুব। (১৯৬৪)। মাইলস্টোন (মূল আরবি: মা'আলিম ফিত্ তারীক)

অধ্যায় ৫-উপসংহার

বর্তমান বিশ্বে পশ্চিমা সংস্কৃতি এমন এক শক্তিশালী প্রবাহে পরিণত হয়েছে, যা সমাজের প্রতিটি স্তরে গভীর প্রভাব ফেলেছে। মুসলিম সমাজও এই প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। আধুনিকতা ও অগ্রগতির নামে আমরা অনেক সময় এমন মূল্যবোধ গ্রহণ করছি, যা ইসলামি আদর্শের পরিপন্থী। ফলে আজকের সমাজে দেখা যাচ্ছে আত্মিক শূন্যতা, পারিবারিক ভাঙন, ভোগবাদ ও নৈতিক অবক্ষয়।এই গবেষণার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে, পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব কেবল বাহ্যিক নয়, এটি মানুষের চিন্তা ও জীবনের দিকনির্দেশক শক্তিকেও প্রভাবিত করছে। পুঁজিবাদ, ভোগবাদ, গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে মুসলিম সমাজে এমন এক মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে, যেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে স্বাধীনতা, এবং দায়িত্ববোধের পরিবর্তে উপভোগই জীবনের লক্ষ্য হয়ে উঠছে।ইসলাম এই সংকটের একটি পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান প্রদান করে। ইসলাম বলে, উন্নয়ন মানে কেবল বস্তুগত অগ্রগতি নয় বরং আত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।” (সূরা আর-রাদ, ১৩:১১)

অর্থাৎ, পরিবর্তনের সূচনা হতে হবে প্রতিটি ব্যক্তির অন্তর থেকে।এই গবেষণার আলোচনায় দেখা গেছে পুঁজিবাদ মানুষের ভেতরে ধনলোভ সৃষ্টি করে গণতন্ত্রের নামে পশ্চিমা চিন্তা সমাজে নৈতিক বিভাজন ঘটায় গণমাধ্যম নৈতিকতার পরিবর্তে ভোগবাদ ছড়ায় অর্থনৈতিক প্রভাব মুসলিম দেশগুলোকে নির্ভরশীল করে তোলে আর পরিবার ভেঙে পড়লে সমাজ তার ভিত্তি হারায়।তবে ইসলাম এই সমস্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান দেয় আত্মশুদ্ধি, ন্যায্য অর্থনীতি, নৈতিক নেতৃত্ব, শিক্ষা সংস্কার, এবং পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করা।এই গবেষণার ৪র্থ অধ্যায়ে মুক্তিলাভের যে উপায়গুলো আলোচিত হয়েছে, তা মূলত ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বাস্তবসম্মত রূপরেখা দেয়। পরিবারে নৈতিকতা, শিক্ষায় ইসলামি মূল্যবোধ, গণমাধ্যমে সত্য ও কল্যাণের প্রচার, এবং সমাজে দায়িত্বশীল নেতৃত্ব এই চারটি স্তম্ভের ওপরই গড়ে উঠতে পারে একটি আত্মনির্ভর, নৈতিক ও সচেতন মুসলিম সমাজ।বিশেষভাবে আত্মশুদ্ধি ও দু’আ হলো এই মুক্তির কেন্দ্রবিন্দু। কারণ মানুষের ভেতরের পরিবর্তন ছাড়া বাইরের পরিবর্তন সম্ভব নয়। আত্মশুদ্ধি মানুষকে লোভ,

অহংকার ও ভোগবাদ থেকে মুক্ত করে; আর দু'আ মানুষকে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হতে শেখায়। যখন ব্যক্তির অন্তর আল্লাহভীতিতে পরিপূর্ণ হয়, তখন সে সমাজে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, এবং তখনই প্রকৃত ইসলামি চেতনা পুনর্জীবিত হয়। একজন মুমিনের কাছে বস্তুবাদী সমাজের সকল জাঁকজমক ও জৌলুসই তুচ্ছ জাহিলি সমাজের মূল্যবোধ, মানদণ্ড, রীতিনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুই তার কাছে ঘৃণ্য। তাগুতি শাসনব্যবস্থার ধারকরা যতই শক্তি ও বাহাদুরি দেখাক, মুমিন তাকে বিন্দুমাত্র পরোয়া করে না। সুতরাং, একজন মুমিন আসলেই সকল বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ। তার আদর্শ, বিশ্বাস, চিন্তাধারা ও মূল্যবোধ সবকিছুই শ্রেষ্ঠ এ কারণে এই সমাজের হুজুগে মাতাল জনগণ গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে কোনো বিষয়ের প্রতি ঝুঁকে পড়লেও একজন মুমিন তা গ্রহণ করে নেশ না। মুমিন তার গ্রহণ-বর্জনের মানদণ্ড গ্রহণ করেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছ থেকে। তার জ্ঞানের উৎস হলেন মহাজ্ঞানী সত্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। তাঁর কাছ থেকেই সে পথনির্দেশ নেয়, তাঁর কাছ থেকেই সে জেলে নেয়-কোনটা সে গ্রহণ করবে, কোনটা বর্জন করবে। কাকে ঘৃণা করবে, আর কাকে ভালোবাসবে। তিনি যে নির্দেশনা দেন, তা সে নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে চলে।

পশ্চিমা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজের সবচেয়ে কার্যকর প্রতিরক্ষা হলো "Moral Resistance" অর্থাৎ, আত্মিক শক্তি ও নৈতিক সচেতনতা। এই শক্তিই মানুষকে নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে দৃঢ় রাখে।অতএব, পশ্চিমা প্রভাব থেকে মুক্তি কোনো বাহ্যিক লড়াই নয়, বরং এটি একটি আত্মিক ও নৈতিক সংগ্রাম। এই সংগ্রাম শুরু হয় নিজের অন্তর থেকে, পরিবারে বিস্তার লাভ করে, সমাজে দৃঢ় হয় এবং নেতৃত্বে রূপ নেয়। ইসলামি নীতিমালা অনুযায়ী যদি সমাজ গঠিত হয়, তবে কোনো বিদেশি সংস্কৃতি আমাদের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে নষ্ট করতে পারবে না।

মুসলমান হিসেবে আমাদের উচিত ইতিহাস থেকে এবং বর্তমান বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ থেকে শিক্ষা নেওয়া। বারবার প্রমাণ হয়েছে পশ্চিমকে খুশি করার চেষ্টা অর্থহীন, আর তাদের সঙ্গে নিজেদের মূল্যবোধ মেলানোর চেষ্টা আরও বেশি ক্ষতিকর। জাতিসংঘ বা তথাকথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ওপর ভরসা করেও মুসলিম জাতির কখনো কল্যাণ হয়নি; বরং এসব প্রতিষ্ঠান প্রায়ই শক্তিশালী পশ্চিমা স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করে। তাই বিভ্রান্তিকর পশ্চিমা দর্শন, তত্ত্ব ও মতবাদের পিছনে ঘুরে সময় নষ্ট না করে আমাদের সম্পূর্ণভাবে দ্বীনের দিকে ফিরে আসা জরুরি। বিশুদ্ধ তাওহিদের শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করে মুসলিম পরিচয়কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। ইসলামকে

বোঝা ও পালন করতে হবে সেইভাবে যেভাবে বুঝেছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ, যারা ছিলেন কুরআনের প্রকৃত প্রজন্ম। এ সময় আমাদের স্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে: পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও ক্রমবর্ধমান শ্বেতসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমরা কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলব। আমাদের চিনতে হবে, এই আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম সারির প্রতিরক্ষাবাহিনী কারা। কারণ দিগন্তে বিপদের কালো মেঘ জমছে, আর পশ্চিমা উগ্রবাদ ও শ্বেতসন্ত্রাস ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজকে ঘিরে ফেলছে। সময় শেষ হওয়ার আগেই আমাদের জাগতে হবে এবং আমাদের ইসলামি পরিচয়, নৈতিকতা ও ঐক্যকে শক্তিশালী করতে হবে।

সবশেষে বলা যায় ইসলাম কোনো সংকীর্ণ ধর্ম নয়; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষকে দুনিয়ার ভারসাম্য ও আখিরাতের মুক্তি দুটোই দেয়। তাই মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের পথ কেবল পশ্চিমা অনুকরণে নয়, বরং নিজস্ব ইসলামি চেতনার পুনরুজ্জীবনে।যে সমাজ আল্লাহর প্রতি অনুগত, নৈতিকতায় দৃঢ়, এবং মানবকল্যাণে নিবেদিত সেই সমাজই প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ও উন্নত সমাজ। এই চেতনা ফিরিয়ে আনাই আমাদের মুক্তির মূল চাবিকাঠি।